উম্মাতুন ওয়াহিদাহ

আমরা এক উম্মাহ

রামাদান- ১৪৪২ হিজরী / এপ্রিল- ২০২১ ইংরেজি ইস্যু - ০৫

জামাআত কায়িদাতুল জিহাদের অফিসিয়াল ম্যাগাজিন
উম্মাতুন ওয়াহিদাহ- ইস্যু-০৫ এর নির্বাচিত প্রবন্ধ অনুবাদ

সূচী

ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের নেপথ্যেঃ পরিভাষার চতুর্জাল এবং ষড়যন্ত্রের গভীরতল	০১
ফতোয়াঃ ফিদায়ী ও ইদাদী কার্যক্রমের মাঝে উপযোগিতা নির্ণয়ের তুলনা	০৮
মিশরের পানি বিষয়ক নিরাপত্তা	১২
কোরআনের দৃষ্টিকোণ এবং কিছু ঘটনা : সমকালীন হালচিত্রের ওপর ভাবনা ও পর্যবেক্ষণের ক্যাপশন	১৮
মানব সভ্যতার জন্য ইসলামী শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা	২৪
স্ট্র্যাটেজি বিষয়ক কিছু আলোচনা	৩১
দুই মুজাদ্দিদ: উসামা বিন লাদেন ও আযযাম: পরস্পর সাংঘর্ষিক নাকি ভিন্নধর্মী? তৃতীয় আসর: উভয় শায়খের দৃষ্টিতে বৈশ্বিক জিহাদ	৩৬

ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের নেপথ্যেঃ পরিভাষার চতুর্জাল এবং ষড়যন্ত্রের গভীরতল

উসামা মাকদিসী

(প্রথম পর্ব)

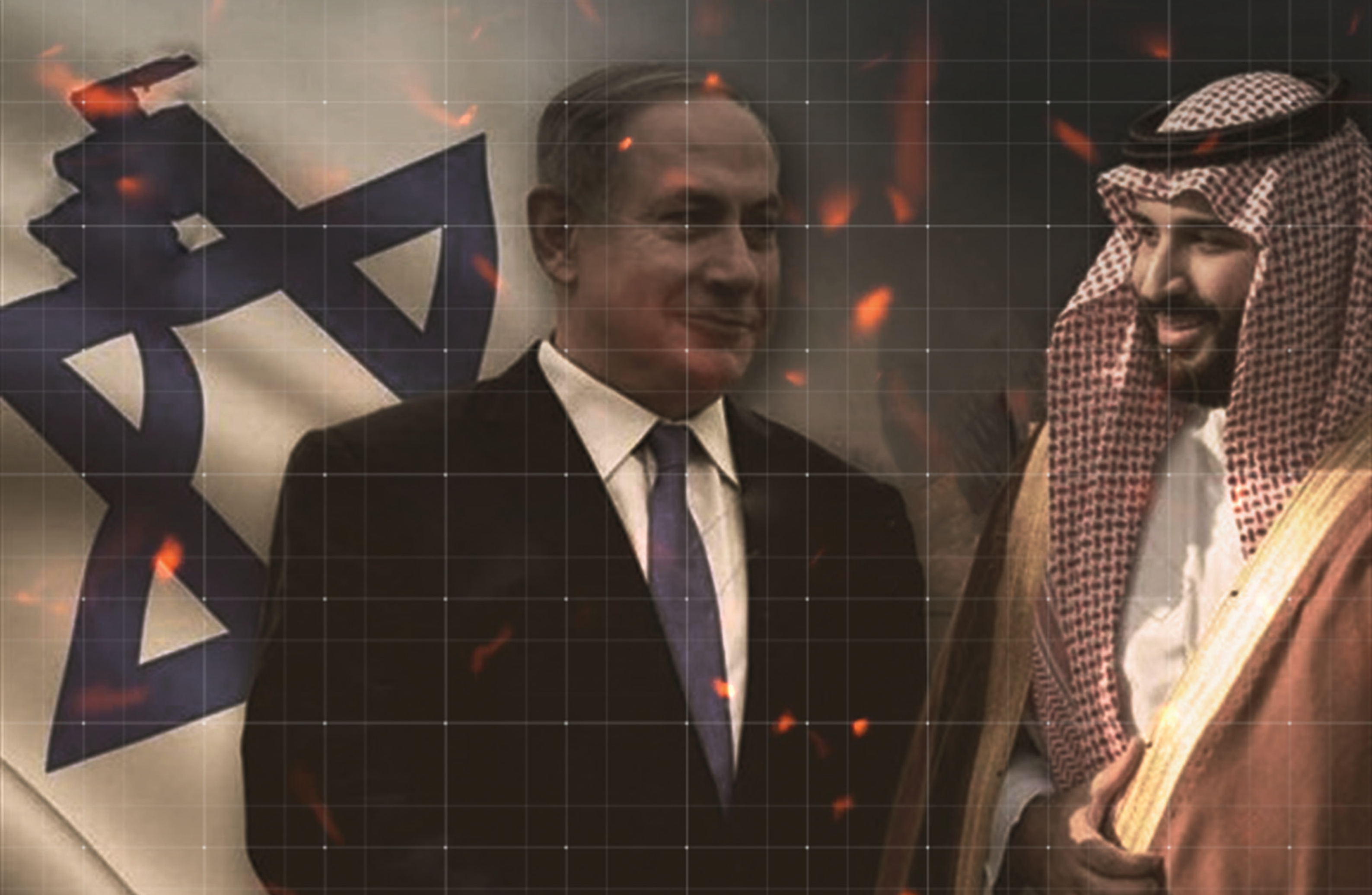

বর্তমান সময়ে উদ্ভাবিত উদ্দেশ্যমূলক বিভিন্ন পরিভাষা ও টার্মের ব্যবহার মানবসমাজের সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক সাধারণ গতিপ্রবাহ রোধে, স্বভাবজাত অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিবাচক সহজ সরল কাঠামো ভেঙ্গে দিতে একটি ভয়ানক মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের সমসাময়িক ইসলামিক ঘটনা প্রবাহে এই সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ এবং সর্বজনীন ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মত পরিভাষাগুলো ইহুদিদের ভয়ানক উদ্দেশ্যমূলক পারিভাষিক ফাঁদের প্রথম সারিতে রয়েছে। এগুলোর উদ্দেশ্য মূলত ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মুসলিম মানসিক কাঠামোর ধ্বংস সাধন করা, মুসলমানদের চিন্তাসূত্রের ঐক্য বিনষ্ট করা, মুসলিম ও ইহুদি জাতিসত্তার মর্মমূলে বিদ্যমান ধর্মীয় প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেয়া। পরিভাষার ব্যবহার দিয়ে আরম্ভ হওয়ার পর এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা মুমিনদের আল ওয়ালা ওয়াল বারা, কাফেরদের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদির মত ইসলামিক মৌলিক আকিদা বিনষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ লক্ষ্যেই শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সংবাদিকতা ও সামরিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ; এমনিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন চটকদার পরিভাষা ব্যবহার করে থাকে ইসলামের শত্রু গোষ্ঠী।

এ কারণেই এজাতীয় পরিভাষাগুলোর লক্ষ্য, টার্গেট ও ভয়াবহতা ভালভাবে উপলব্ধি করাটাই আমাদের মুসলিম ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ভবিষ্যতের ওপর এসবের নেতিবাচক ও জাতবিনাশী প্রভাব ও ফলাফল বোঝার জন্য যথেষ্ট। আমাদের অনাগত মুসলিম প্রজন্মের জন্য এসব পরিভাষা কিরূপ বিপদ ডেকে আনতে পারে তা বুঝতেই আমাদেরকে এসবের গভীরে যেতে হবে।

সুবিবেচক মুমিন ব্যক্তি মাত্রই জানেন, ষড়যন্ত্র ও উদ্দেশ্যমূলক এসব পরিভাষা ব্যবহারের দ্বারা ইসলামের শত্রু শিবিরের সাধারণ আরেকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। মুসলমানদের জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় মুছে দেয়া এবং মুসলিম মানসপটে তাদের সঙ্গে আপোষের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি মুদ্রিত করা ছাড়াও তাদের আরও লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলমানদের জিহাদি জজবা ও রোষানল থেকে নিজেদের দেশকে নিরাপদে রাখা, মানব সভ্যতা বিধ্বংসী তাদের অর্থনীতি সুরক্ষিত রাখা, আরব অঞ্চলগুলোতে সভ্যতা সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের জনবিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠা, সারা বিশ্বের ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনের ভূমিতে সমবেত হতে প্রস্তুত করা এবং ইসলামী ভূমিগুলোকে ইহুদি ভূমি বানাবার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা। আর এভাবে ভূমি দখল হলো গোটা ইসলামী বিশ্বের ওপর তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভূমিকা মাত্র।

> **শুরু থেকেই কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে জেঁকে বসা তাগুত গোষ্ঠী ও ইসরাইল রাষ্ট্রের মাঝে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়ে আছে। কারণ তাদের মাঝে কোন সংঘর্ষ বা যুদ্ধ যে হচ্ছে না তা তো চাক্ষুষ বাস্তবতা।**

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, ইসলামপন্থীদের ভেতর অনেকেই তাদের এসব ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত বুঝতে না পেরে ইহুদিদের সঙ্গে ভয়ানক এই সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিষয়গুলোকে তাদের সঙ্গে শরিয়া সন্ধি চুক্তি ও লেনদেন জায়েজ হবার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন। এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য তা হল, শুরু থেকেই কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে জেঁকে বসা তাগুত গোষ্ঠী ও ইসরাইল রাষ্ট্রের মাঝে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়ে আছে।

কারণ তাদের মাঝে কোন সংঘর্ষ বা যুদ্ধ যে হচ্ছে না তা তো চাক্ষুষ বাস্তবতা। তথাপি নতুন করে এজাতীয় শান্তি প্রতিষ্ঠা, সন্ধি, চুক্তি ও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ইত্যাদির কি প্রয়োজন? নিঃসন্দেহে নতুনভাবে এগুলো সামনে আনার পেছনে আরো কিছু গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে। তাদের সেই উদ্দেশ্য হলো কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর ক্রোধপ্রাপ্ত গোষ্ঠী (ইহুদি গোষ্ঠী) ও বিভ্রান্তদের (খ্রিস্টান গোষ্ঠীর) সঙ্গে পাকাপাকি সম্পর্ক স্থাপন, তাদের সঙ্গে আপোষের আয়তন রচনা, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক মৈত্রী সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণের ঐশী নির্দেশ লঙ্ঘন। আর এভাবেই ইসলামের আঁতুড়ঘর থেকেও ইসলামের উচ্ছেদ সাধন এবং নবুয়াত পূর্ব জাহেলী পৌত্তলিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার জায়নবাদী ও ইসলামবিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়নের প্রকল্পে সমান অংশীদার মুরতাদ এসব শাসকগোষ্ঠী।

আর এতে কোন ধোঁয়াশা নেই যে, কোরআনের ঘোষণার ভিত্তিতে আমাদের স্বতঃসিদ্ধ ইসলামী আকীদা হলো ইহুদিরা ইসলাম ও মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু দলগুলোর একটি। তাইতো আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন—

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟

অর্থঃ "আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন"। (সুরা মায়েদা- ৮২)

وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ

অর্থঃ "পয়গম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়"। (সুরা আলে ইমরান- ২১)

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ

অর্থঃ "এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে"। (সুরা মায়েদা- ৪২)

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ

অর্থঃ "আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায় ভাবে"। (সুরা নিসা- ১৬১)

কোরআনুল কারিম এরূপেই ইহুদিদের পরিচয় আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। তাদের রুচি প্রকৃতি ও মানসিকতা আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছে। অন্যদের সঙ্গে তাদের আচরণ নীতি ও প্রবণতা আমাদেরকে জানিয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে কুরআনুল কারীম আমাদেরকে তাদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বনের নির্দেশনা দিয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে আমরা কি তাদেরকে যথার্থরূপে চিনতে পেরেছি? ষড়যন্ত্র, চতুরতা, ধোঁকা, প্রতারণা, জমিনের বুকে অনিষ্ট সাধন, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, ফেতনা উদ্গীরণ এবং কথা ও বক্তব্যের মাঝে বিকৃতি সাধন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরিচালিত তাদের রাজনৈতিক পলিসি আমরা কি ধরতে পেরেছি? আমরা কি বুঝতে পেরেছি, তারা কতটা ওয়াদা খেলাপী করে এবং তাগুতি আইন দ্বারা কিভাবে বিচার ফয়সালা করে? আমরা কি স্মরণ রেখেছি যে, তারা আল্লাহ তাআলার মাঝে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে বলে মন্তব্য করে? যেমন কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

অর্থঃ "যারা বলেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা হলাম সম্পদশালী"। (সুরা আলে ইমরান- ১৮১)

এমনিভাবে তাদের ব্যাপারে আরও ইরশাদ হচ্ছে—

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟

অর্থঃ "আর ইহুদীরা বলেঃ আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত"। (সুরা মায়েদা- ৬৪)

অতি সংক্ষেপে বললে ইহুদীরাই সেই জাতি, যারা আল্লাহ তাআলার লানদ ও অভিসম্পাত প্রাপ্ত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে—

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ

অর্থঃ "বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত"। (সুরা মায়েদা- ৭৮)

তো আল্লাহ তায়ালার মূল্যায়ন ও বিচারের পর আর কারো কিছু বলার থাকতে পারে?!

আমরা যদি ইতিহাসের পাতায় ইহুদিদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখবো, তাদের গোটা ইতিহাস চক্রান্ত, কূটচাল, ধোঁকা, প্রতারণা ও জালিয়াতি দিয়ে ভরপুর। তারাই তো মাসীহে সাদিক ঈসা আলাইহিস সাল্লাম-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। অতঃপর আল্লাহর হুকুমে এ ব্যাপারে তারা বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলা ঈসা আলাই সাল্লাম-কে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন। তারাই তো আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাধিকবার হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রতিবার হেফাজত করেছেন। তারাই তো সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন ফেৎনা তৈরি করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে সাহাবায়ে কেরামকে তাদের ফেতনা থেকে হেফাজত করেছেন।

মানবেতিহাসের পাতায় পাতায় তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের চিত্র। তারা কত যে ফেৎনা উদগীরণ করেছে! কত দেশ ও জাতি ধ্বংস করেছে!! কোন জাতি বা সভ্যতা তাদের ধ্বংসলীলা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে? তাদের কূটচাল তো এতই প্যাঁচালো ও মারাত্মক ছিল যে, পশ্চিমাদের ভেতর কেউ কেউ যেমন রোবসপিয়ের (ম্যাক্সিমিলিয়েন দ্য রোবসপিয়ের) পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে, "বিশ্বব্যাপী যত অনাচার বিশৃঙ্খলা

আমরা কি জানি যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন—

كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ

অর্থঃ "তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত"। (সুরা মায়েদা- ৭৯)

وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

অর্থঃ "কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান করানো হয়েছিল"। (সুরা বাকারা- ৯৩)

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "তারা জেনে বুঝে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করে"। (সুরা আলে ইমরান- ৭৮)

আমরা কি জানি যে, মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের কূটচাল ও পরিকল্পনার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই? তাইতো আল্লাহ তায়ালা তাদের বক্তব্য তুলে ধরে কুরআনে ইরশাদ করেন—

لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ

অর্থঃ "উম্মীদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই"। (সুরা আলে ইমরান- ৭৫)

আমাদের কি জানা রয়েছে যে, তারা কোনো চুক্তি সন্ধি বা প্রতিশ্রুতিকে কিছুমাত্র মূল্য দেয় না? এরশাদ হচ্ছে—

أَوَكُلَّمَا عَـٰهَدُوا۟ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ "কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে, বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না"।(সুরা বাকারা- ১০০)

আরো ইরশাদ হচ্ছে—

ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

অর্থঃ "যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ তাদের মধ্য থেকে, অতঃপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃতচুক্তি লংঘন করে এবং ভয় করে না"। (সুরা আনফাল- ৫৬)

ও অস্থিতিশীলতা রয়েছে তার মূল হোতা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী গোপন ইহুদি রাজ; তারাই এসব ঘটিয়েছে এবং ঘটিয়ে চলেছে।" জায়ন-ক্রুসেডীয় আমেরিকার অনেক নেতা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও তাদের দেশের জনগণের প্রতি ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। এদের মাঝে প্রথম হলেন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন। অপর একজন নেতা হলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। ১৭৮৯ সালে মার্কিন সংবিধান রচনাকালে একটি বক্তব্যে তিনি আমেরিকান জনগণকে ইহুদিদের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন-

"ইহুদীরা যে ভূমিতে পা রেখেছে সেখানেই তারা নৈতিক অবক্ষয় ডেকে এনেছে, সমঝোতামূলক বাণিজ্যিক নীতিমালা ভঙ্গ করেছে, বরাবরই তারা বিচ্ছিন্নতা আঁকড়ে থেকেছে; কখনোই কোন বিষয়ে অন্য কারো সঙ্গে অংশগ্রহণ করেনি।.... সরাসরি সাংবিধানিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আজ যদি তাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরে না রাখা হয়, তবে এক শতাব্দীকালের ভেতর তারা এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটাতে শুরু করবে যে, তারা সরাসরি আমাদের জনগণের উপর খবরদারি করবে এবং তাদেরকে শাসন করতে আরম্ভ করবে।... শেষ পর্যন্ত আমাদের অধঃস্তন প্রজন্মের অবস্থা এই হবে যে, দেখা যাবে ইহুদি জনসাধারণের খাবার সরবরাহের জন্য তারা বাগানে কাজ করছে!"

আজ যখন কিছু কিছু আরব রাষ্ট্র ইসরাইলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ঘোষণা দিচ্ছে, যখন তারা বেওকুফ ট্রাম্পের ঘোষিত ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি প্রকল্পের সঙ্গে একাত্মতার জানান দিচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে জরুরি হয়ে পড়েছে, এজাতীয় ভয়ানক পদক্ষেপ ও পরিকল্পনার ব্যাপারে আরো একবার গভীরভাবে চিন্তা করা। কারণ এসবের কারণে আমাদের মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর এতটাই মারাত্মক প্রভাব পড়বে যা বলার নয়। তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, মুসলিম শাসকবর্গের প্রতি এবং আপামর জনসাধারণের প্রতি কল্যাণকামিতার অঙ্গীকার পোষণ করে তদনুযায়ী কাজ করা। আল্লাহ তাআলা সঠিক পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু কোরআনের ভাষ্যমতে সঠিক সেই পথ থেকে কিছু লোক তো অবশ্যই বিচ্যুত হবে। একমাত্র তিনিই সাহায্যের কামনাস্থল, সর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন একমাত্র তাঁরই সমীপে।

এইমাত্র আমরা এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছি যে, 'সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ' নামের যে ক্রুসেড-জায়নবাদী ডিল অব দ্য সেঞ্চুরির কথা শোনা যাচ্ছে, এর বুনিয়াদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ইসলামিক চিন্তা-চেতনা ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার ওপর এক মারাত্মক পদদলন, যার মাধ্যমে ইসলামী আকীদা স্তম্ভের একটি বড় অংশ পুরোপুরিভাবে ধসে পড়বে। তাদের উদ্দেশ্য ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, ইসলামী ইতিহাস ও দ্বীনে মোহাম্মদী থেকে ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষ এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের বৈধতা ও আবশ্যকতা তুলে দেয়া। তারা চায় মুসলিম মানসকে তারা এমনভাবে বিন্যস্ত করবে যাতে ইহুদিদের সঙ্গে কোন প্রকার সাংঘর্ষিকতা তৈরি না হয় এবং ইহুদিদের সবকিছুই মুসলিমরা খুব সহজে মেনে নেয়। তাদের পরিকল্পনামতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের ক্রুসেড-জায়নবাদী মিশনের বিরুদ্ধে মুসলিমরা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। অতএব তাদের deal of the century নামক প্রোজেক্ট মেনে নেয়ার অর্থ হল, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুসলমানদের ওপর এক বিরাট আঘাত, বর্তমান অবস্থার প্রতি অবহেলা প্রসূত দায়িত্বজ্ঞানহীন আত্মসমর্পণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ভূমি জবরদখলকারী জায়নবাদী চক্রকে শরীয়ত সম্মত বৈধ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যকার চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ককে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ সহজাত কোমল সম্পর্কে রূপান্তরের

অপচেষ্টা। এই ধারার সকল পরিকল্পনার পেছনে তাদের লক্ষ্য হলো, ইহুদী মুসলিম সম্পর্ক বিনির্মাণের চেষ্টা। এটাই হলো ইহুদি সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রজেক্টের মাঝে ইসলাম ও মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থবিরোধী সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বিষয়।

অতএব আমরা বুঝতে পারলাম আরব ইজরায়েল সম্পর্ক বিনির্মাণের এই চেষ্টার নেপথ্যের বিষয় আসলে কি? তা হলো মুসলিম মানস থেকে ইহুদিদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের আকিদা উঠিয়ে দেয়া, আগ্রাসী ইহুদিদের সঙ্গে কুফরি সম্পর্ক নির্মাণের এক কদাকার চিত্র অঙ্কন করা, মুসলিম উম্মাহর জন্য ইহুদিদের প্রতি সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও ভালোবাসা পোষণকে আইনি বৈধতা দিয়ে এই উভয় জাতির মাঝে অতি সহজ সরল স্বাভাবিক সহজাত কোমল সম্পর্ক তৈরি করা, ইহুদিদের প্রতি শত্রুতা পোষণের ইসলামী আকীদা বিনষ্ট করে কেবলই শান্তিচুক্তি ও রাজনৈতিক সন্ধিস্থাপনই নয়; বরং রীতিমতো ইহুদিদের প্রতি ভালোবাসা ও সদ্ভাব পোষণের আকিদা মুদ্রিত করা। অথচ আল্লা'হ তা'আলা ইরশাদ করেন—

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ

অর্থঃ "আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন"। (সুরা মায়েদা- ৮২)

রাজনৈতিক কূটনৈতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক এ সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ হল আকীদার ওপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভূমিকা মাত্র যা এই সমস্ত পরিকল্পনা ও মিশনের মূল লক্ষ্যবস্তু ও অভীষ্ট বিষয়। এমনিভাবে আরব উপসাগরীয় সরকারগুলোর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়াও নানান প্রতারণামূলক প্রকল্পের ভূমিকা মাত্র। এই সম্পর্ক এমন সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রতিনিধিত্বশীলদের মাঝে স্থাপিত হচ্ছে যারা আমাদের মুসলিম জাতিসত্তার সঙ্গে পুরোপুরিভাবে সম্বন্ধযুক্ত নয়। তো এই সমস্ত সম্পর্ক স্থাপন ও পারস্পরিক নৈকট্য বৃদ্ধি-প্রক্রিয়াগুলোর মাঝে যে বিষয়টা সবচেয়ে ভয়ানক এবং যেটা তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে—জাতিগতভাবে ইহুদি ও মুসলিম জনগোষ্ঠীরগুলোর মাঝে পাকাপাকিভাবে সম্পর্ক স্থাপন।

কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী আকীদা ও ধর্ম বিশ্বাসের ওপর এটা কত বড় আঘাত! ইসলামী মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুমিন হিসেবে আমাদের উচিত, এ জাতীয় সকল অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করা। কারণ এসব প্রকল্প যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে গোটা মুসলিম বিশ্বের ওপর আগ্রাসনের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়ে যাবে। আর তখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিভ্রান্তির এমন অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে, যা আমাদের বর্তমান বিভ্রান্তিকেও হার মানাবে। যাইহোক খোলাসা করে বললে সচেতনতামূলক আমাদের এই প্রবন্ধের উপরোক্ত অংশের উদ্দেশ্য হল, পাঠকদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করা যে, ইসরাইলের সঙ্গে সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের নৈকট্য স্থাপনের নানা তোড়জোড় চলছে, সেগুলোর বুনিয়াদি সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে— ধর্মীয়, জিহাদী, চিন্তাগত, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উপাদানের সমন্বয়ে ইহুদী - মুসলিম সাংস্কৃতিক নৈকট্য-বৃদ্ধি ও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের মধ্য

কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী আকীদা ও ধর্ম বিশ্বাসের ওপর এটা কত বড় আঘাত! ইসলামী মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুমিন হিসেবে আমাদের উচিত, এ জাতীয় সকল অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করা।

দিয়ে মৌলিক ইসলামী চেতনার ভিত্তি গুঁড়িয়ে দেয়া এবং মুসলিম আকিদা-বিশ্বাসের মাঝে ভয়ানক বিকৃতি সাধন করা। আমাদের সামনের নিবন্ধে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতে প্রতারণামূলক এই সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া, উপায় ও কূটনৈতিক উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। এর দ্বারা পাঠকবর্গের সামনে এ বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করা সহজ হবে এবং এসবের মোকাবেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে মুসলমানদের চিন্তার দ্বার উন্মোচিত হবে। সে নিবন্ধে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আরো আলোচনা করবো, আরব ও ইসলামিক মানস, চিন্তা-চেতনা ও আকিদা বিশ্বাস ইহুদিবাদী রূপে গড়ে তোলার জন্য ইহুদীরা কি কি উপায় ও মাধ্যম অবলম্বন করছে। আরবের বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক ফোরাম ও সংস্থাকে তারা কি ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেগুলোর উপর হস্তক্ষেপ চালাচ্ছে? আরব এসব প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ও চিন্তাগত অভিমুখ তারা কি পরিবর্তন করে দিচ্ছে এবং তাদের গন্তব্য নির্ধারণ কি ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করছে? পশ্চিমা মানসকে ইহুদিবাদীরূপে গড়ে তোলার জন্য তারা যেসব পন্থা অবলম্বন করেছে, পশ্চিমা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে একটি জায়নবাদী লবি তৈরিতে তারা যেভাবে সাফল্য অর্জন করেছে, মধ্যপ্রাচ্য নিয়েও কি তাদের এমন কোন পরিকল্পনা রয়েছে? আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বে ইহুদিরা যেভাবে সাফল্য অর্জন করেছে আমাদের এই আরব ইসলামিক ভূখণ্ডগুলোতেও তাদের তেমন সাফল্য অর্জনের সুযোগ কি রয়েছে?

এমনই বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব লিখতে চেষ্টা করেছি আমরা সামনের নিবন্ধে। শুরুতে শেষে সর্বাবস্থায় নির্ভর করি একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন!

ফতোয়াঃ ফিদায়ী ও ইদাদী কার্যক্রমের মাঝে উপযোগিতা নির্ণয়ের তুলনা

শাইখ আবু ইয়াহিয়া লিবি রহিমাহুল্লাহ

প্রশ্নঃ
আফগানিস্তান বা অন্যকোন ভূমিতেঃ দীর্ঘমেয়াদে হোক কিংবা স্বল্প মেয়াদে– ফিদায়ী কার্যক্রম অথবা জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও সরাসরি লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ –এর মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তম?

জবাবঃ

الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর...

হামদ ও সালাতের পর...

আসলে এ বিষয়ে আমার যেটা মনে হয় তা হল— সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালাই মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ— এই মাসআলায় সার্বজনীন একক কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে ব্যাপারটা এমন নয় যে, উচিত কোন একটি সিদ্ধান্ত সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বরং এখানে একেক সময়ে একেক কাজের উপযোগিতা তৈরী হতে পারে। একেক ব্যক্তির বেলায় একেকটা বিষয় উপযুক্ত সাব্যস্ত হতে পারে। একেক জায়গায় একেক কাজ অধিক ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে।

মোটাদাগে কয়েকটি কারণ সামনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারবো, অবস্থাভেদে করণীয়ের এমন প্রভেদ কেন সূচিত হয়? প্রথম কারণঃ ফিদায়ী কর্মকাণ্ড অথবা জিহাদের প্রস্তুতি মূলক কার্যক্রমের মধ্য থেকে কোন একটি নির্বাচন করে তা পালনকারী ব্যক্তির যোগ্যতা, ইসলাস ও একনিষ্ঠতা, আল্লাহর সঙ্গে সততা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ঃ তার কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামের উপকার হওয়া না হওয়ার বিষয়টি। অতএব যখন কোনো একটি কাজের মাধ্যমে অর্জিত ইসলামের ফায়দা ও উপকার হবে অধিক এবং বড় মাপের, তখন সে কাজের প্রতিদানও হবে তেমনি বড়। তো মুজাহিদদের মাঝে কেউ যদি এমন থাকে, যার পক্ষে এমন ফিদায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব যে তা আল্লাহর শত্রুদের জন্য মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করবে; আর উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত ওই ব্যক্তির মত অন্য কেউই উপস্থিত নেই, তো এটি স্পষ্ট যে, এমন ব্যক্তির ফিদায়ী কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামের অধিক কল্যাণ সাধিত হবে- জিহাদের অন্যান্য শাখায় কাজ করা যেমন জিহাদি অনুশীলন সম্পন্ন করা ও প্রস্তুতি মূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকা ইত্যাদি অপেক্ষা। এর বিপরিতও হতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির বেলায় হতে পারে, মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য, তাদেরকে সবরকম জিহাদী অনুশীলন করানোর জন্য, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর বেঁচে থাকাটা কোন ধরনের ফিদায়ী হামলায় আত্মোৎসর্গের চাইতে অধিক উপকারী ও ফলপ্রসূ— এমন স্থান বা প্রেক্ষাপটে, যেখানে কিনা উক্ত ফিদায়ী কার্যক্রমের জন্য অপর কেউ রয়েছে। এ কারণেই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে দোয়া করেছেন—

> "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা পূরণ করুন! হে আল্লাহ এই মুষ্ঠিমেয় মুসলমানকে যদি আজ আপনি ধ্বংস করে দেন, তবে এই জমিনে আপনার এবাদত করার মতো কেউ থাকবে না।"

কারণ শাহাদাত লাভ করা যদিও মুমিন জীবনের একটি আকাঙ্খাই শুধু নয় বরং সর্বোৎকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা, তথাপি মুষ্টিমেয় মুসলমানের বেঁচে থাকাটা জমিনের বুকে ইসলামের নাম নিশানা বাকি থাকা এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র ইসলামের বাণী পৌঁছে যাওয়ার একটি বোধগম্য কারণ। যদি ধরে নেয়া হয়, বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানদের ভেতর সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শাহাদাতবরণকারীরা সকলেই কামিয়াব

ও সফলকাম হয়ে গেলেন; তারা জান্নাতের অত্যুচ্চ মর্যাদা লাভ করলেন এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি দ্বারা ভূষিত হলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও তো ঠিক যে, এই জমিন ইসলামের নুর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদতের সমস্ত বরকত এ ভূমি থেকে বিদূরিত হয়ে গেল। আর তেমনটা হলে জাহেলিয়াত ও জুলুম-অত্যাচারের দ্বারা চারিদিক এমনভাবে ছেয়ে যেতো যার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানেনা। তো বদরের মুজাহিদ সাহাবীদের জামায়াত ধ্বংস হয়ে গেলে যেমনিভাবে এজাতীয় নানা অনিষ্ট অনর্থ জমিনের বুকে সৃষ্টি হতো—প্রয়োজনের সময় যেকোনো জামাতের ক্ষেত্রেই যা সত্য—তেমনিভাবে কখনো একই ধরনের অকল্যাণ ও ভয়াবহতার মুখোমুখি হতে হয় একক কোন ব্যক্তি নিহত বা শহীদ হয়ে গেলে। আর তার কারণ হলো সে ব্যক্তির ঈমানের জোর, উম্মাহর জন্য তার খেদমতের বিস্তৃত পরিধি, আল্লাহর পথে তার অধিক ধৈর্য ও কষ্ট স্বীকার, মুমিনদের অন্তরে দৃঢ়তা ও সাহসের সঞ্চার —এককথায় তার অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকার বহুমুখী কল্যাণ ও উপকার।

এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা তাকাতে পারি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দিকে। মুরতাদদের বিরুদ্ধে যখন জিহাদ আরম্ভ হলো তখন তিনি সশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চেয়ে ছিলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেন। সাহাবীরা তাঁকে বলেনঃ

"আপনি আপনার তরবারী অনুগ্রহ করে খাপবদ্ধ করুন, আপনার বিরহে আমাদেরকে কষ্টে নিপতিত করবেন না।! কারণ আল্লাহর কসম! যদি আমরা আপনাকে হারাই, তবে আপনার পর কিছুতেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা ফিরে আসবেনা।"

অপর বর্ণনায় এভাবে এসেছে— "হে আল্লাহ রাসূলের খলিফা! আমরা আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আজ যদি আপনি নিজেকে রণাঙ্গনে উপস্থিত করেন আর তখন যদি আপনার বিপদ ঘটে তবে মানুষের মাঝে কিছুতেই শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না। আপনার বেঁচে থাকাটাই শত্রুপক্ষের অধিক মর্মপীড়ার কারণ এবং তাদের ওপর সবচেয়ে শক্ত আঘাত।"

প্রিয় পাঠক! সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য লক্ষ করুন— "আপনার বেঁচে থাকাটাই শত্রুপক্ষের অধিক মর্মপীড়ার কারণ এবং তাদের ওপর সবচেয়ে শক্ত আঘাত।"

তৃতীয়তঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘ হায়াত লাভ করে, সেইসঙ্গে তার আমল উৎকৃষ্ট মানের হয়, এতে করে দিনদিন তার মর্যাদা ও পুণ্যের পাল্লা ভারী হতে থাকে; বিশেষত যখন সে ব্যক্তি জিহাদ, হিজরত, রিবাত ও ইদাদের ভূমিতে নিজের জীবন অতিবাহিত করে। তবে তার অর্থ এই নয়, যে ব্যক্তি তার আগেই ময়দানে শাহাদাত লাভ করেছে তারচেয়েও সে অধিক মর্যাদাবান। কারণ হলো সর্বাবস্থায় বাহ্যিক আমলের আধিক্য-ই মান-মর্যাদা নির্ধারণের মূল কারণ হয় না। বরং সেইসঙ্গে কার্যত ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ, সে ব্যক্তির মজবুত ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত, তাঁর বলিষ্ঠ সততা ও ঈমানী জোর, আল্লাহর পথে তার অধিক ধৈর্য ধারণ ও কষ্টসহিষ্ণু হওয়া—এই ব্যাপারগুলিও অধিক মর্যাদা প্রাপ্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষত যখন আল্লাহর দ্বীনের ঝান্ডাবাহী সংগ্রামী সাধকদের সংখ্যা হয় স্বল্প যারা আল্লাহর পথে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তাবলীগ ও জিহাদের পথে কষ্টসহিষ্ণু হয়েছেন এবং মহৎ এই সংগ্রামের প্রারম্ভেই জীবন উৎসর্গিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এজাতীয় ব্যক্তিবর্গ পরবর্তীদের জন্য হেদায়েত ও প্রেরণার আলোকবর্তিকা। এদের সঙ্গে পরবর্তীতে যারা মিলিত হবেন তারা পূর্ববর্তীদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হবেন। পরবর্তী লোকদের নেক আমলগুলো পূর্ববর্তীদের আংশিক আমলের স্থান লাভ করবে।

এ কারণে আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীসে রয়েছে—

أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللَّهِ أيُّ النَّاسِ خيرٌ؟ قالَ: مَن طالَ عمرُهُ ، وحَسنَ عملُهُ ، قالَ: فأيُّ النَّاسِ شرٌّ؟ قالَ: مَن طالَ عمرُهُ وساءَ عملُهُ

এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? নবীজি বললেনঃ যে ব্যক্তি দীর্ঘ হায়াত লাভ করলো সেই সঙ্গে নেক আমল সঞ্চয় করলো। তখন সে ব্যক্তি বললঃ কোন ব্যক্তি সর্ব নিকৃষ্ট? তখন নবীজি এরশাদ করলেনঃ যে ব্যক্তি দীর্ঘ হায়াত লাভ করল কিন্তু সে নিকৃষ্ট আমল সঞ্চয় করলো। —ইমাম আহমদ, তিরমিজি এবং দারিমি হাদিসটি সংকলন করেছেন।

এতদসত্ত্বেও হামজা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু যিনি হিজরতের পর একেবারেই শুরুর দিকে শাহাদাত বরণ করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে তাঁর ব্যাপারে ইরশাদ করেন—

سيِّدُ الشُّهداءِ حمزةُ بنُ عبدِ المطَّلبِ ، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمره ونهاه فقتله

"শহীদদের সর্দার হলেন হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালেব এবং ওই ব্যক্তি যে কোনো জালিম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সৎ কাজের আদেশ করল আর অসৎ কাজে বারণ করল, যার ফলে সে জালেম শাসক ওই ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলল।" ইমাম তিরমিজি ও ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেছেন হাদীসের সনদ সহিহ।

তো সাহাবীদের ভেতর এমন অনেকেই তো ছিলেন যারা দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছিলেন সেইসঙ্গে নেক আমল সঞ্চয় করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার পূণ্যের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি তারা হামজা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা পর্যন্ত দূরে থাকুক তার ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারেননি। আসলে এটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যদা বড় তাদের অপেক্ষা, যার পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সূরা আল হাদীদ: ১০)

তো এজাতীয় কাজগুলোর ভেতর উপস্থিত সময়ে সর্বাধিক কল্যাণকর ও উপকারী কাজটি নির্ণয়ের দায়িত্ব হচ্ছে যথাযথ দায়িত্বশীল ও কর্তৃপক্ষের যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শিতা থাকার দরুন যথার্থ বিচার-বিবেচনায় সক্ষম। তবে এসবের কারণে এ পথ বন্ধ হয় না যে, ব্যক্তি নিজের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে, নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাগুলো তুলে ধরবে এবং যার চিন্তা-চেতনা, দ্বীনদারী, বুদ্ধি-বিবেচনা ও আমল আখলাক তার কাছে পছন্দ হয় এমন একজন প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে নিজের বিষয়গুলো নিয়ে পরামর্শ করবে যাতে করে তার জন্য উপযোগী আর আল্লাহর দ্বীনের জন্য উপকারী সর্বাধিক কল্যাণকর সিদ্ধান্তটি তার জন্য গৃহীত হয়। আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞ!

তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যদা বড় তাদের অপেক্ষা, যার পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সূরা আল হাদীদ: ১০)

মিশরের পানি বিষয়ক নিরাপত্তা

খালেদ আল মাহদী

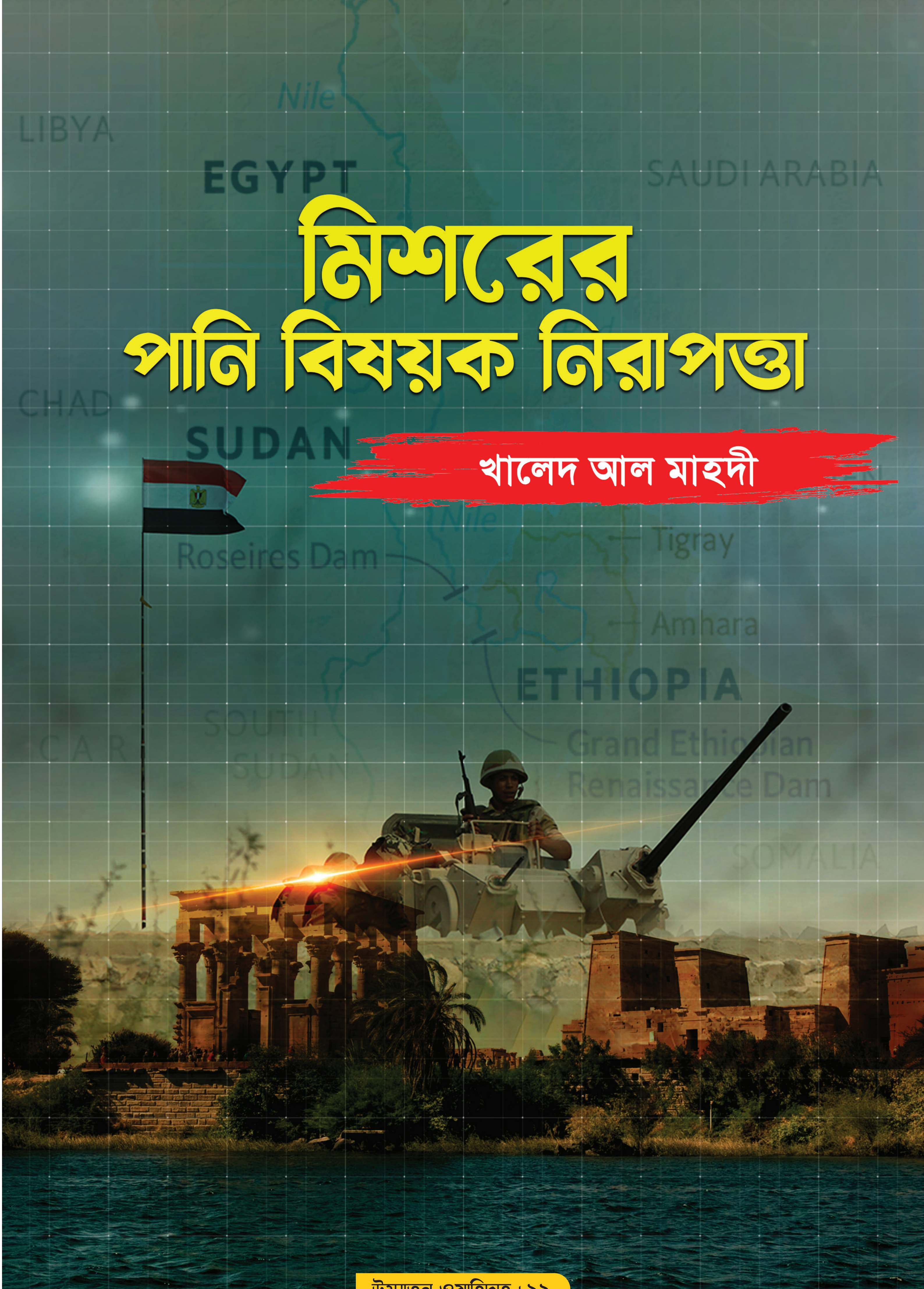

উম্মাতুন ওয়াহিদাহ । ১২

জলসম্পদ পলি ও মৎস্যসম্পদের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হিসেবে মিশরের জন্য নীল নদকে ধরা হয় প্রাণভোমরা। প্রাকৃতিক আকারে জলপ্রবাহের প্রক্রিয়ায় যে কোনো ত্রুটি মিশরের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ, কারণ মিশরের জন্য জল প্রবাহের অন্য কোন বিকল্প শাখা নেই। এছাড়াও ভূ প্রকৃতির কারণে মিশর অন্যান্য আরব দেশগুলির মত অর্ধ-শুকনো অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় এখানে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পানি পাবার আশা করা যায় না। কারণ গোটা এই আরব অঞ্চলের বিরাট অংশ শুধুই ধু ধু মরু প্রান্তর। ১৯৫২ সালের বিপ্লবের পূর্বে মিশরের সরকারগুলো এ কারণেই নীলনদ অববাহিকার পুরো এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ভূ-প্রাকৃতিক গভীরতল সংরক্ষণে আগ্রহী ছিল। কারণ মিশরের পানি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এটি অতি জরুরী, যেহেতু অববাহিকার স্রোতধারা ও উপনদী থেকে বয়ে আসা জলপ্রবাহের এক ফোঁটা পানির ব্যাপারেও অবহেলা করা মিশরের স্বার্থ বিরুদ্ধ। আর স্বাভাবিকভাবেই তা সুদানের পানি সুরক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মিশরের সমস্যা হল, তার ভৌগলিক অবস্থান প্রাকৃতিক জলসীমা থেকে অনেক দূরে। যতটুকু জলপ্রবাহ তাদের কাছাকাছি রয়েছে তা নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে বিরোধ। এই বিরোধ মিশর আর সেসব দেশের মাঝে দেখা দিয়েছে যেগুলো এই জলপ্রবাহ কাজে লাগিয়ে নিজেদের জল, কৃষি ও অর্থনৈতিক প্রকল্পসমূহ সচল রাখতে চায়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে নিজ দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতে প্রয়োজনের সময় রপ্তানির মাধ্যমে নিজেদের অর্থনীতি ঊর্ধ্বমুখী রাখার স্বার্থ তাদের। সেইসঙ্গে বর্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দিলে এ প্রকল্পগুলো বৃদ্ধির হুমকি দিয়ে কূটনৈতিক ফায়দা হাসিলের ফন্দি। এমনিতে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ইথিওপিয়া ব্লু নীল অঞ্চলে তাদের কৃষি ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য কিছু প্রকল্প স্থাপন ও নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। কৃষি ফসলের ক্রমবর্ধমান সংকটের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তারা এমনটা করতে চেয়েছিল। তখন মিশরের রাজধানীতে বিপদের ডংকা বেজে ওঠে। ইথিওপিয়া তার প্রকল্পগুলো আরম্ভ করতে গেলে মিশর তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগেরও হুমকি দেয়। কিন্তু সেসব হুমকি ইথিওপিয়াকে তাদের প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত এগুলো স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইথিওপিয়া নিজেকে গুছিয়ে নেয়। মিশরের প্রাণ নীলনদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস দেশ হিসেবে কেবল ইথিওপিয়ার প্রকল্পগুলি মিশরের মাথাব্যথার কারণ নয় বরং ইথিওপিয়ার মতোই উচ্চাভিলাষী আরো বেশকিছু রাষ্ট্র রয়েছে। তারাও নীল নদের উপনদীগুলোতে হস্তক্ষেপ করতে চায়। যেমন রয়েছে কেনিয়া।

তো এসব হস্তক্ষেপের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো নিজেদের উন্নয়ন কর্মসূচির বিকাশ সাধনে আগ্রহী। পানির সুরক্ষা নিশ্চিত করণের এই দ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে এই সংঘাতে দখলদার ইসরাইল রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ। নিজেদের দাবি অনুযায়ী নীলনদ থেকে পানির অংশ লাভের জন্য দখলদার রাষ্ট্রটি সিনাই ও পশ্চিম তীর জুড়ে পাইপ বসিয়ে নেগেভ মরুভূমি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে চাচ্ছে। তাদের ইচ্ছা হল, নেগেভ মরুভূমি অঞ্চলের জনগণকে বাস্তুচ্যুত করে তড়িঘড়ি সেখানে এমন বিরাট কৃষি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ তৈরি করা, যা বিশেষত ইসরাইলের সর্বশেষ কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের প্রধান কৃষি উৎপাদনের জাতীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে।

ইসরায়েলি গবেষণা সংস্থাগুলো জানিয়েছে, সিনাইয়ের মধ্য দিয়ে একটি খাল নির্মাণের মাধ্যমে নীলনদ পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে নেগেভ প্রান্তরে পানি সরবরাহ করা গেলে দেশের পানি সংক্রান্ত অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এতে আরও ফায়দা এই হবে যে, অভিবাসনের সুপ্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হবে। কারণ তাদের প্রকল্পের কেন্দ্রস্থল সে অঞ্চলে কয়েক হাজার নতুন ইহুদি বাসিন্দার অভিবাসন হবে। ১৯৭৯ সালে নীলনদ থেকে পানি লাভের ইসরাইলি দাবির কথা আমরা ভুলে যাইনি। কিন্তু যেটা মনে হয় তা হল, সে সময় ওই দাবি মেনে নেয়ার মত উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়নি, যেহেতু ইসরাইলি রেজিমের সঙ্গে তৎকালীন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত কর্তৃক স্বাক্ষরিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারণ ক্রোধে ফুঁসে উঠেছিল।

মিশরের জন্য নীলনদের পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও ইসরাইল বরাবরই তা অবহেলা করে এসেছে। শুরুতে ও শেষে নিজেদের প্রয়োজনকেই দখলদার রাষ্ট্রটি প্রধান হিসেবে দেখছে। নিজেদের জাতীয় স্বার্থে পানি সুরক্ষার সমস্যাটি পুরোপুরি সমাধানকল্পে ইজরাইল কখনোই নিজেদের প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি থেকে সরে আসেনি, যদিও এতে মিশরের অর্ধেক জনগোষ্ঠী মারা যায়।

ইথিওপিয়া তার পানি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে সুবিধা অর্জনের জন্য এতদঞ্চলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অতঃপর মিশরে হোসনি মোবারকের নেতৃত্বাধীন সরকার যখন গঠন হলো, সে সরকার আমেরিকা ও ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার ওপর যখন বিরাট গুরুত্বারোপ করল, এমনিভাবে সরকারি খাতগুলোকে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে বিদেশি পুঁজিপতিদের জন্য যখন দ্বার উন্মুক্ত করে দিল, নিজ পিতার পর জামাল মোবারককে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার বিনিময়ে সেনাবাহিনীর অনেক সামরিক নেতাকে দুর্নীতিবাজ পুলিশ বাহিনীতে যুক্ত করে অসৎ দুর্নীতিবাজ এ লোকগুলোর জন্য সম্পদের পাহাড় গড়ার সুযোগ যখন ছেড়ে দেয়া হলো, তখনই ইথিওপিয়া নীল নদের উপনদীগুলোতে তার প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের এবং বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসলো। এক্ষেত্রে ইথিওপিয়া ইসরাইলের সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে ফায়দা উঠিয়েছিল। ইহুদি বিশেষজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ইথিওপিয়ার প্রকল্পগুলো সমর্থন করতে ইসরাইল মোটেও বিলম্ব করে নি সেসময়। সেইসঙ্গে প্রকল্পগুলোর পক্ষে তারা এমন অবৈজ্ঞানিক যুক্তি দাঁড় করালো যে, এসব প্রকল্প নাকি নীলনদ থেকে মিশরের ন্যায্য পানির অংশে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

অতঃপর সিসির অভ্যুত্থান এবং রাষ্ট্র সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ জোটে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ইথিওপিয়া তার সর্ববৃহৎ প্রকল্প 'রেনেসাঁ বাঁধ' নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। প্রকৌশল বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম অমান্য করে ইথিওপিয়া নীলনদের প্রধান উপ নদীর উপর সে বাঁধ নির্মাণ করেছিল। নির্মিত সে বাঁধ মিশর ও সুদানের স্বার্থের সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক ছিল। আমেরিকা ও ইসরাইল ইথিওপিয়ার এ প্রকল্পের প্রতি তড়িঘড়ি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল। আর এই দিকে সৌদি ও আরব আমিরাতও সমভাবে সমর্থন জানিয়েছিল। সে সময়ে সিসি কিছুই বলার সাহস পায়নি, নতুবা রাবেয়া আল-আদাউইয়া শহরের অন্যান্য অঞ্চলে সে যে গণহত্যা সংঘটিত করেছিল, তার ধারাপাত আরম্ভ হয়ে যেত। এভাবেই সময় যেতে থাকে। মিশর সুদান এবং ইথিওপিয়ার মাঝে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

এসবের মধ্য দিয়েই মিশরের রাজনীতি বিশ্লেষক ও রাষ্ট্রীয় বোদ্ধা মহলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সিসি মিশরীয়দের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। ইচ্ছাকৃতভাবে সিনাইয়ের অধিবাসীদের ঘরবাড়ি তাদের মাথার ওপর ধসিয়ে দেয়া এবং গোটা অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে বাস্তুচ্যুত করা, এমনিভাবে নীল নদের পানি চুরি করার জন্য পাইপ লাইন স্থাপনের বৃহৎ প্রকল্পে ন্যাক্কারজনকভাবে ইসরাইলের সঙ্গদান, যা ছিল ১৯৭৭ সালে আনোয়ার সাদাত কর্তৃক ইসরায়েলিদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মাফিক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্বোধন মাত্র। এসবের মধ্য দিয়ে আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসি তার বিশ্বাসঘাতকতার এবং ইসরাইলের জন্য তার তাবেদারীর চূড়ান্ত উদাহরণ দিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৭ সাদাত কর্তৃক স্বাক্ষরিত সে প্রকল্পের নাম ছিল 'জমজম পাইপলাইন'। সে সময় আরবের বিরূপ অবস্থানের কারণে সে প্রকল্পটি সাফল্যের মুখ দেখেনি। রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং জনসাধারণের মঞ্চ থেকে পরস্পরে মিশর ও ইসরাইলের স্বার্থবিরোধী সে প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। এদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আরবদের অবস্থান যখন পাল্টে গেল, তারা যখন তড়িঘড়ি দখলদার ইজরাইলি রেজিমের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বন্দোবস্ত করে ফেলল, শুধু তাই নয়; বরং যখন তারা ইসরাইলের সঙ্গে সামরিক প্রতিরোধ জোট গঠন করল, তখন সে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ অবারিত হয়ে গেল। এখন তার বিরুদ্ধে যেকোনো গণ প্রতিবাদ ও গণবিক্ষোভ শক্তভাবে দমন করা হবে। সেই দমন-পীড়নের ক্রুসেড-জায়নবাদী নাম দেয়া হবে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

এখন উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে উপসাগরীয় অর্থায়নে। আর বিনিময়ে তাদের চাই হোয়াইট হাউজের সমর্থন ও কৃপা দৃষ্টি। কারণ হোয়াইট হাউজেরও প্রচেষ্টা, নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রেখার বাইরে যেকোনো রাজনৈতিক বা গণ আন্দোলন মোকাবেলায় ন্যাটো-আরব জোট গঠনের।

এসবের ভিত্তিতে অনায়াসে অনুমান করা যাচ্ছে যে, নীলনদ থেকে মিশরের পানির অংশ বর্তমান হার যা ৫৫ বিলিয়ন ঘনমিটারের অধিক, তা থেকে অচিরেই আরো কমে গিয়ে অর্ধেকে নেমে আসবে যা মিশরের জন্য একটি সাক্ষাৎ বিপর্যয়। আর ইসরাইলও তার ঘোষিত অংশের দাবি নিয়ে পরিতুষ্ট থাকবে না, বরং তারা আরও বেশি অংশের দাবি করে বসবে। এতদঞ্চলে ইসরাইলের সম্প্রসারণ নীতির দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায়, এখানে যেসব যুদ্ধে ইসরাইল জড়াচ্ছে, তার বেশিরভাগই পানি সুরক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ইজরাইলে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়া থেকে ইহুদিদের অভিবাসন বৃদ্ধির কারণে দখলদার দেশটির আরো বেশি পানির প্রয়োজন। এদিকে রেনেসাঁ বাঁধ প্রকল্প সম্পন্ন হয়ে গেলে ইসরাইল ও ইথিওপিয়া আমেরিকা সহ আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন নিয়ে মিশরের জন্য পানি প্রবাহের হার নিয়ন্ত্রণ করবে। আর তখন অনায়াসেই ইজরাইল মিশর ও সুদানের সমস্ত স্ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে, ততদিন পর্যন্ত যদি কূটনৈতিক দরকষাকষির পরিবেশ বহাল থাকে।

এখন আসি মিশরের জনগণের কি হবে? তারা ক্যান্সার, লিভারের সমস্যা ও কিডনি ফেল হয়ে যাওয়ার মত মারাত্মক কিছু ব্যধির ঝুঁকিতে আগে থেকেই রয়েছে। কারণ নীল নদের তীরে নির্মিত কারখানাগুলোর ল্যান্ডফিল ও বর্জ্যভূমি নীলনদের পানিকে দূষিত করে দিয়েছে। এখন সামনের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে নীল নদে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে আরো বড় ও মারাত্মক আকারে এসব রোগের জীবাণুগুলো ছড়িয়ে পড়বে। এছাড়াও পানির স্তর হ্রাসের কারণে তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দিক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তখন মিশরীয়দের সামনে কেবল দুটো পথ থাকবে-
১-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা
২-পূর্ব থেকেই মিশরীয়দের কাছে সলিল সমাধিস্থল বলে পরিচিত ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অভিবাসনের প্রচেষ্টা

১৯৫২ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে মিশরের সামরিক নেতৃত্বের কৌশলগত ভুলগুলোর সংক্ষিপ্তসার

১) ১৯৫৬ সালে জামাল আব্দুল নাসের কর্তৃক সুদানকে মিশর থেকে পৃথক করার সিদ্ধান্ত মিশরীয়দের জন্য ছিল আত্মঘাতী প্রথম পদক্ষেপ। এই সিদ্ধান্তের কারণে মিশর ইথিওপিয়ার সরকারগুলোর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা এবং এমন যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে ইথিওপিয়াকে বিরত রাখার কৌশলগত সংগতি ও আনুকূল্য হারিয়েছিল, যা নীল নদের পানিতে মিশরের ন্যায্য অংশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

২) হোসনি মোবারকের আমলে মিশর সরকার কর্তৃক দক্ষিণ সুদান পৃথক হয়ে যাবার প্রকল্পটি সমর্থন করা, কায়রোতে আন্দোলনের অফিস খোলার সুযোগ করে দেয়া, সেইসঙ্গে সৌদি, আমিরাত ও লিবিয়ার পক্ষ থেকে ডক্টর জন গারাংকে প্রদত্ত বিপুল পৃষ্ঠপোষকতায় অংশগ্রহণ। উপরোক্ত আরব সরকারগুলোর এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণ হলো, দক্ষিণ সুদানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রকল্পটিকে তারা তৎকালীন বশির সরকারের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা কম বিপদজনক বিবেচনা করেছিল।

৩) এরপর এলো আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সামরিক অভ্যুত্থান। যেকোনো রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মিশরকে পুরোপুরি জিম্মি বানাবার জন্য আব্দুল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার ইথিওপিয়াকে রেনেসাঁস বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বশেষ ও চূড়ান্ত অনুমোদন-স্বাক্ষর করে দিল। এখন এই প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে ইজরাইল অভূতপূর্ব উপায়ে এক বিরাট সাফল্য অর্জন করবে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখার ছড়ি সে নিজের হাতে নিয়ে নেবে। মিশর-ইথিওপিয়া দ্বন্দ্বকে ইজরাইল স্বাগত জানাবে।

‘এক শত্রুর পেছনে অন্য শত্রুকে লেলিয়ে দেবার’ কূটকৌশল অবলম্বন করবে। অসাধু এই ইহুদি চক্র মিশর-ইথিওপিয়ার মাঝে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় আবির্ভূত হবে। এভাবেই বিচারক সেজে নীলনদ থেকে নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য নির্লজ্জভাবে তারা ব্ল্যাকমেইল করবে। তাদের চাহিদা যদি পূরণ করা না হয় তাহলে মিশরীয়-ইথিওপীয় মিত্রদেরকে সেই বাঁধে আঘাত করার হুমকি দিয়ে কোণঠাসা করে ফেলবে। কারণ এই বাঁধের ওপর আঘাত মিশর সুদান ও ইথিওপিয়ার জন্য বিরাট বিপর্যয়ের হুমকি।

এই দৃশ্যপট যে বাস্তবের সবচেয়ে কাছাকাছি তা বোঝার জন্য বাস্তবসম্মত কিছু লক্ষণ রয়েছে:

• ইসরাইলের স্বার্থে এতদঞ্চলে শক্তির ভারসাম্যহীনতা।

• ইজরাইলকে নিন্দা জানিয়ে গৃহীতব্য যেকোনো সিদ্ধান্তে আমেরিকার ভেটো প্রদান।

• আরব অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব যা সম্মিলিত আরব প্রতিবাদের আশাকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে।

• জায়নবাদী আরব সরকারগুলোর পক্ষ থেকে জায়োনিস্ট চক্রের সঙ্গে তড়িঘড়ি সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টা, যার দরুন ইজরায়েলের স্বার্থবিরোধী যেকোনো আরব রাষ্ট্র দৃশ্যপট থেকে ছিটকে পড়বে।

• মিশরের জাতীয় নিরাপত্তা এই প্রশ্নের মাঝে আটকে পড়া যে, সেনাবাহিনী কোন উপায়ে নিজেদের শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখবে? আর আর আমরা পূর্ব থেকেই জানি, এই সেনাবাহিনী নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য জনগণের স্বার্থ বিরোধী যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত। এমতাবস্থায় সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কথা বলে সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।

সমাধানঃ

এতসব সমস্যার সমাধানকে আমরা তিনটি পয়েন্টে সংক্ষেপে নিয়ে আসতে পারিঃ

১) বিশ্বস্ত কর্মকর্তা বলে যদি মিশরীয় সেনাবাহিনীতে কিছু বাকি থাকে তবে তাদের দ্বারা আব্দুল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকারকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা।

২) মিশরীয় যুদ্ধবিমানগুলোর সাহায্যে রেনেসাঁ বাঁধ নির্মাণস্থলে বিমান হামলা চালিয়ে সেখানকার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া।

৩) নতুন শর্ত এবং আন্তর্জাতিক মহলের কোন মধ্যস্থতা ছাড়াই মিশর সুদান ও ইথিওপিয়ার ত্রিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা।

উপরোক্ত তিনটি পয়েন্টের বাইরে আর যেকোন সমাধানের কথা চিন্তা করা হোক না কেন, তা হবে মিশর ও সুদানের জনগণের জন্য প্রহসন মাত্র। আর আন্তর্জাতিক মহল অথবা আমেরিকা ও রাশিয়ার অধীনে দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রচেষ্টা মিশরীয় সেনাবাহিনীর ধারাবাহিক বিশ্বাসঘাতকতা ও নাটকীয়তার একটি অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। পাঠক মহোদয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, জর্ডান সরকার যখন ইয়ারমুক নদী সংলগ্ন একটি স্থানে বাঁধ নির্মাণ করতে চেয়েছিল তখন ইসরাইল কি করেছিল? দেশটি সরাসরি এমন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং কঠোর হুমকি দিয়েছিল যার দরুন প্রকল্পটি স্থগিত হয়ে যায়। তারপর মিশর ও সুদান যখন দুই দেশে প্রবাহিত পানির অংশ বৃদ্ধির জন্য জংলাই চ্যানেল প্রকল্পের কাজ করতে যাচ্ছিল, তখন অজ্ঞাতপরিচয় বিমান থেকে হামলা চালিয়ে পুরোপুরিভাবে প্রকল্প থামিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং এতে কাজ পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একই সময়ে কিন্তু ইজরাইল দক্ষিণ সুদান বিচ্ছিন্ন করার প্রকল্পকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ২০১১ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ সুদান পৃথক হয়ে যায় এবং মিশর তার সেনাবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে একটি নতুন কৌশলগত মাত্রা হারায়।

যাইহোক এই অন্ধকার পরিস্থিতির মাঝেও দিগন্তের বুকে আশার আলো ফুটে উঠেছে। পূর্ব আফ্রিকার মুজাহিদ সন্তানরা উম্মাহকে এই আশার আলো দেখিয়েছেন। কেবল সাম্প্রতিক কালেই নয় বরং ইথিওপিয়ার যোদ্ধাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে উম্মাহর জন্য তারা সে উদাহরণ পেশ করে এসেছেন।

তাই এতদঞ্চলের মুসলিম ভাইদের উচিত, তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের কল্যাণ কামনা করা, তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়া, তাদেরকে সমর্থন করা এবং তাদের প্রতি আস্থা রাখ। তবেই সেই শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম সার্থক হবে যারা তাদেরকে ক্ষুৎপিপাসা দিয়ে হত্যা করতে চায়।

পরিশেষে মিশরের জনগণকে বলবো, অধিকার কেউ বুঝিয়ে দেয় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়—একথা আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত।

কুরআনে পাকে এরশাদ হচ্ছে—

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله

অর্থঃ অতএব অচিরেই তোমরা স্মরণ করবে যা আমি তোমাদেরকে বলেছি। আমি আমার এ বিষয় আল্লাহর নিকট অর্পণ করছি। [সুরা গাফির, আয়াত-৪৪]

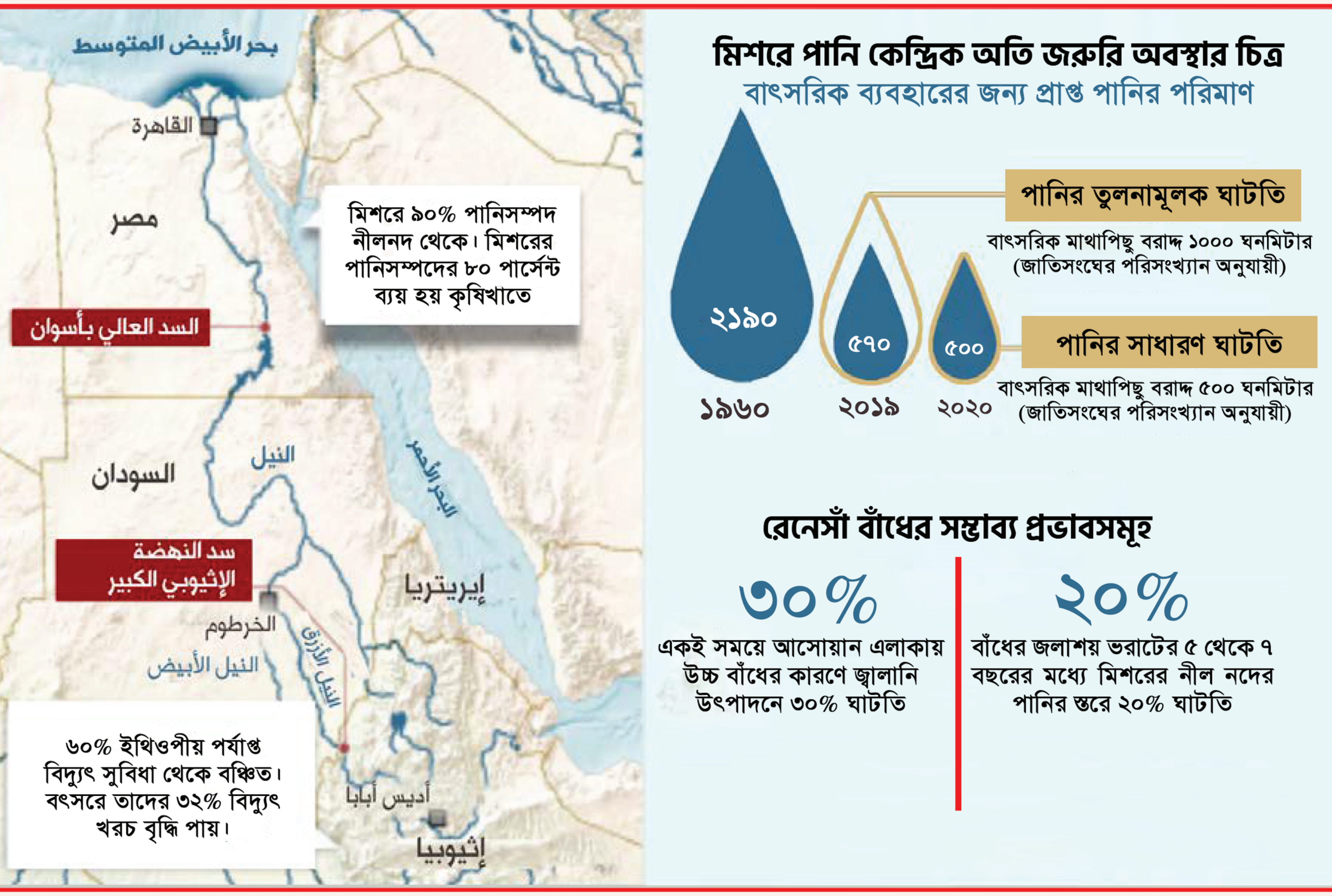

জার্মান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টার্নেশনাল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স মিশর কায়রো আসোয়ানের উচ্চ বাঁধ, নীলনদ, সুদান, ইরিত্রিয়া, অ্যাডিস আবাবা হোয়াইট ব্লু নীল গ্র্যান্ড ইথিওপীয় রেনেসাঁস ড্যাম (ইথিওপিয়ার সর্ববৃহৎ রেনেসাঁ বাঁধ), লোহিত সাগর।

কোরআনের দৃষ্টিকোণ এবং কিছু ঘটনা
সমকালীন হালচিত্রের ওপর ভাবনা ও
পর্যবেক্ষণের ক্যাপশন

সালিম আশ-শারীফ

ইবনে সালমান এবং ইহুদি গোষ্ঠী

মূলত ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের কোন প্রবল ঢেউ তো নয় বরং রিয়াদের শাসক, আমিরাতের ক্রাউন প্রিন্স এবং তাদের সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির নেতৃত্বে পরিচালিত একটা ঘৃণ্য সুনামি। এই তিন কুটিল চরিত্র ইহুদিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির নীতিগুলো প্রতিষ্ঠায় দারুন প্রয়াসী। তাদের এসব জঘন্যতম কর্মকাণ্ডে সর্বশেষ সংযোজন হলো, যেমনটা নিউজ এজেন্সিগুলো প্রকাশ করেছে, একটি অভিনীত নির্মিত উপসাগরীয় সিরিজ, তাতে দেখানো হয়েছে যে, মূল শত্রু ইহুদিরা নয়; বরং তোমার উপকার পাওয়ার পর যে তোমাকে দংশন করল সেই হলো মূল শত্রু।

আমরা আশ্বস্ত আছি যে, ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের যে বৃহৎ অপচেষ্টা, সিরিয়ালে উপস্থাপিত সমাধানটি তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, যা সাফল্যের মুখ দেখবার নয়। পূর্বের প্রয়াসগুলোর মত এটিও নিঃসন্দেহে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ মুসলিমরা রমজান মোবারকের এই বিশেষ সময়ে কোরআনে কারিম পাঠ করছে। তারা ইহুদিদের জাতীয় চরিত্র, তাদের সঙ্গে যাপিত সময়কালের অভিজ্ঞতাচিত্র কখনো ভুলে যাবেনা।

মুসলমানদেরকে সতর্ক করে কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا - وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا - فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا - وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا - وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا - بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا - وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا - فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا - وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا -

অর্থঃ আপনার নিকট আহলে-কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুতঃ এরা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে। বলেছে, একেবারে সামনাসামনিভাবে আমাদের আল্লাহকে দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন; অতঃপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মূসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম।

আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় ঢোক। আর বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালংঘন করো না। এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য এবং অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির দরুন যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন। অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক।

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি।

বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।

বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল-তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন।

আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায় ভাবে। বস্তুত; আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব। —[সূরা আন নিসা: ১৫৩—১৬১]

এই যে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, এই যে যুগে যুগে তাদের অভিন্ন আচরণের হালচিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরলেন, তাদের এসব ধারাবাহিক কুকর্ম ও জঘন্য কর্মকাণ্ডের পরেও কি মেনে নেয়া যায় যে, কেউ আমাদের কাছে এসে দাবি করবে, ইহুদিরা সৌহার্দের বার্তাবাহক, তারা শান্তির দূত?! যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত রসূলদের সঙ্গে তাদের আচরণ আমাদের কাছে স্পষ্ট, সেখানে অন্যান্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের আচরণ কিরূপ হতে পারে তা কি আমরা অনুমান করে নিতে পারি না?!

ইয়েমেনের গোলকধাঁধা আর লিবিয়ার মরু দোলাচলে উদ্ভ্রান্ত ইবনে যায়েদ

ইবনে যায়েদ। এ যুগের অভিশপ্ত শাসকগোষ্ঠীর আরো একটি ব্যর্থ চরিত্রের নাম। কি চায় এই কুলাঙ্গার? মিশর ও সিরিয়াতে বিপ্লব নস্যাৎ করার পর এবং মালির মরু অঞ্চলে মুজাহিদিনকে আঘাত করার পর ইয়েমেন ও লিবিয়ায় এই ষড়যন্ত্রীর কি ইচ্ছা? কেন সেখানেও এতটা ঘৃণা আর বিদ্বেষের চর্চা?

নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করলে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যাব। প্রশ্নটি হলঃ মিশর অথবা ইয়েমেনে যদি বিপ্লব সফল হতো, সেখানে যদি এমন সরকার গঠন হত, যাদেরকে আমি ইসলামপন্থী না বললেও এ কথা বলতে পারি তারা অবশ্যই স্বদেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী; এমন শ্রেণীর হাতে যদি শাসন ক্ষমতা যেত, শাসক হিসেবে যাদের জন্য প্রবাদতুল্য দুজন ব্যক্তিত্ব হলেন মাহাথির মোহাম্মদ এবং রজব তাইয়্যেব এরদোগান; তো বিশেষত ইয়ামেন অঞ্চলে যদি এমন শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা চলে যেত তাহলে তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াতো? আমরা জানি, স্বাভাবিকভাবেই তখন বিপ্লবের এই সংক্রামক অনু পুরোপুরিভাবে তাদের দেশে ছড়িয়ে পড়তো যেমনিভাবে কোভিড ১৯ সারাবিশ্বে সংক্রমিত হয়েছে।

এটি এমন একটি বিষয় যার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন নেই। একারণেই সুযোগ থাকতে উচিত হল, সমস্ত বিপ্লব ব্যর্থ করে দেয়া, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলোকে স্তব্ধ করে দেয়া, পূর্বের অন্যায়মূলক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং স্বাধীনতা ও ইনসাফের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে ইয়েমেনে আলি আব্দুল্লাহ সালেহকে উৎখাত করার মাধ্যমে সেখান থেকে বিপ্লবের মূল উপড়ে ফেলা হলো। তার বদলে সেখানে তাবেদার শাসক বসানো হলো। এভাবেই সব কিছুর বিরুদ্ধে শরিয়া নীতি প্রয়োগের দখল নেয়া হলো। তাইতো বিপ্লব, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, মুজাহিদদের কার্যক্রম এমনকি খোদ তাদের শরীয়তের বিরুদ্ধে যেকোন পদক্ষেপের উপরও শরীয়তের তকমা লাগানো হলো। এভাবেই ধাপে ধাপে এগিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল তাবেদার সরকারকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে ইয়েমেনের ধন-সম্পদগুলো আত্মসাৎ করা। কিন্তু অনমনীয় সজাগ জনতার আঘাতের মুখে তাদের সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। প্রথম পরিকল্পনা নস্যাৎ হবার পর ইবনে যায়েদ দ্বিতীয় আরেকটি পরিকল্পনার কথা চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। সেটি হচ্ছে ইয়ামেনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলা। উত্তর ইয়ামান এবং দক্ষিণ ইয়ামান। একটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে রিয়াদ। আর অপরটি ধীরে ধীরে আলে জায়েদের আনুগত্যের বলয়ে প্রবেশ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অষ্টম স্টেটে পরিণত হবে। একই প্রতারণার আশ্রয় এবং অভিন্ন স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হয়েছে লিবিয়ার ক্ষেত্রে। পার্থক্য শুধু এই, ইয়ামানকে যেখানে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনে বিভক্ত করা হয়েছে লিবিয়াকে সেখানে পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত করা হয়েছে।

এখন সময়ই বলে দেবে, আল জায়েদের এই কুখ্যাত সন্তান আরবের মহান সম্রাট হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে নাকি মুসলিম জাতির চেতনা ও বলিষ্ঠ আঘাত তার স্বপ্নগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পরিণামে তাকে কোণঠাসা হতে বাধ্য করবে? আর সে নিজেও ভালভাবেই জানে, একবার যদি সে কোণঠাসা হয়ে যায় তাহলে কখনই আমিরাতের রাজনীতিতে তার কোন কর্তৃত্ব চলবে না। তারতো উচিত, তার একান্ত নিকটস্থ লোকদের ব্যাপারেই ভয় করা। কেবল একটি মুহূর্ত, তার মাঝেই অকস্মাৎ এমন নতুন কিছু ঘটে যেতে পারে যা আমাদেরকে হতচকিত করে দেবে। আর এভাবেই এসব শ্রেণীর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী প্রতিফলিত হবে—

প্রথম পরিকল্পনা নস্যাৎ হবার পর ইবনে যায়েদ দ্বিতীয় আরেকটি পরিকল্পনার কথা চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। সেটি হচ্ছে ইয়ামেনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলা। উত্তর ইয়ামান এবং দক্ষিণ ইয়ামান।

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ
يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ
٤٣ ﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن ﴿ تَحْوِيلًا
قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا
٤٤ ﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا ﴿ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا
تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا -

অর্থঃ পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের কারণে। কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতিনীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না।

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভুপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহর সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে।

—[সূরা আল ফাতির: ৪৩—৪৫]

মানব সভ্যতার জন্য ইসলামী শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা

হুসসাম আব্দুর রউফ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী ও রাসূলদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, আমাদের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার ও সাথীবর্গের উপর এবং কেয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণকারী সকল মুমিন মুসলমানের উপর।

হামদ ও সালাতের পর...

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই মানব সভ্যতা বিরাট বিরাট বিপর্যয়ের মুখোমুখি। তন্মধ্যে দৃশ্যমান সবচেয়ে বিরাট বিপর্যয় বোধহয় বর্তমান বিশ্বে চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলো। এই যুদ্ধগুলোতে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ বাস্তহারা হচ্ছে। মানব বসতি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে যে পুনর্গঠনের জন্য কয়েক দশক সময় এবং শত সহস্র বিলিয়ন অর্থের প্রয়োজন। এসব বিপর্যয়ের প্রধান কারণ সম্ভবত বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমানুষকে দারিদ্র্যের জাঁতাকলে পিষ্ট করছে। তারা জীবন ধারণের মৌলিক দাবি মেটাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। রাত দিন পরিশ্রম করেও তারা নাগরিক মৌলিক পাঁচটি অধিকার নিশ্চিত করতে পারছে না। এই অর্থব্যবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামক বিরাট জনগোষ্ঠীকে এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় ফেলে দিয়েছে যে, এই ব্যবস্থার অধীনে চাকুরী করে মৌলিক নাগরিক অধিকার ও জীবন ধারণের বিকল্পহীন দাবি বাসস্থান শিক্ষা ইত্যাদি খরচ বহন করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে ১% এর অনধিক ধনাঢ্য শ্রেণীর মাঝে বেশিরভাগ সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে আছে। এই এক শতাংশের মাঝেই আবার রয়েছে বিভিন্ন রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ, উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশের আমির ও শাসক শ্রেণী এবং তাদের কোলাবোরেটর'দের স্বজনেরা। এমনিভাবে ইসলামী বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র বলে পরিচিত বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশা এদের মাঝে শামিল। আর অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশ জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এনজিও প্রতিষ্ঠান অক্সফাম এবং সুইজারল্যান্ডের অর্থ প্রতিষ্ঠান ক্রেডিট সুইসের রিপোর্ট মতে ২০১৫ সালে বিশ্বের মাত্র ৬২ জন ব্যক্তি গোটা বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা অর্থাৎ ৩.৬ বিলিয়ন ব্যক্তির সম পরিমাণ অর্থের মালিক। আর গোটা বিশ্বের জনসংখ্যার ০.৭ শতাংশের অনধিক সংখ্যালঘিষ্ঠ কিছু মিলিয়নিয়ার বিশ্বের ৪৫ শতাংশ সম্পদের মালিক।

মার্কিন জার্মান ও জাপানের পুরানো রক্তচোষা অর্থনীতির কথা তো বাদই, চীন-ভারত ব্রাজিলসহ আরো যে রাষ্ট্রগুলো নতুন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের সেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও

তার লভ্যাংশ কেবলই কলকারখানা, ইন্ডাস্ট্রি ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যয় হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বরং গোটা বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই পুঁজিপতি ও বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর কাছে আকাশচুম্বী ঋণের দায়ে জড়িয়ে আছে। এ রাষ্ট্রগুলো নিজেদের শাসক ও নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রেও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। বলতে গেলে তারা নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। এখন এরা যতই দাবি করুক বিশ্বের নেতৃত্বে তারাই রয়েছে এবং প্রথম বিশ্বের দেশগুলোর মাঝে তারা গণ্য, তাতে কিছু যায় আসে না।

আর্থসামাজিক যে বিপর্যয় আজ মানব সভ্যতা অতিক্রম করছে, মানবতা আজ যে রকম সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা হল বস্তুবাদী অমানবিক স্বার্থান্বেষী আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি ও আত্মস্বার্থ পূজারী ব্যবস্থার অনিবার্য ফলাফল। আমাদের উপরোক্ত আলোচনা মানবসভ্যতার চলমান বিপর্যয়ের খণ্ডচিত্র। অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত করলে আমরা আরো দেখতে পাই, নীতি-নৈতিকতা, মানবিকতা, মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আজ মানব সভ্যতা কিরূপ সংকট অতিক্রম করছে। এটি বোঝার জন্য আমাদেরকে সাইয়েদেনা হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কালজয়ী বিখ্যাত সেই ভাষণ পাঠ করে দেখতে হবে। বাদশা নাজ্জাশী দ্বীন ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর দরবারে হযরত জাফর দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন:

"বাদশা নামদার! আমরা ছিলাম মূর্খ জনগোষ্ঠী। নিজ হাতে গড়া কৃত্রিম দেব-দেবীর উপাসনা-অর্চনা ছিল আমাদের ধর্মীয় রীতি। মৃত ভক্ষণ, ব্যভিচার ও নৃশংসতা আমাদের সামাজিক রীতিনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। আমরা প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে যেমন অবহিত ছিলাম না, তেমনি দয়ামায়া, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহমর্মিতার শিক্ষার সঙ্গেও ছিলাম অপরিচিত। শক্তিমানরা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের গিলে খাওয়াটাকেই বীরত্ব ও গর্ব করার মতো বিষয় বলে মনে করত।"

বর্তমান বিশ্বে চলমান আধুনিক ও নব্য এই জাহিলিয়াত এবং সমকালীন পশ্চিমা সভ্যতার চিত্রের সঙ্গে উপরোক্ত বর্ণনার কিছু মাত্র পার্থক্য আছে কি? প্রাচীন জাহেলিয়াতের কথা এভাবে বর্ণনা করার পর হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হয়ে বলেন:

"এটাই ছিল আমাদের জাতীয় জীবনদৃষ্টি। আমাদের এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছিল। এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন। তিনি আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী প্রেরণ করেন, যাঁর বংশমর্যাদা সম্পর্কে আমরা অবগত। যাঁর সততা ও সত্যবাদিতা আমাদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্র ও পবিত্রতা আমাদের দৃষ্টির সামনেই আছে। তাঁর শুভাগমন হয়েছে এবং তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাদের সামনে হিদায়াতের এমন এক উজ্জ্বল মশাল তুলে ধরলেন, যার আলোকচ্ছটা মূর্খতা, দুষ্কৃতি ও অনাচারের সব পর্দা আমাদের দৃষ্টিসীমা থেকে অপসারিত করেছে। তিনি বলেন যে তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো, একমাত্র তাঁকেই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রভু হিসেবে গ্রহণ করো। মূর্তিপূজা ত্যাগ করো। এসব হাতে গড়া উপাস্য তোমাদের কোনো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। পথভ্রষ্টতার মূল ভিত্তি হচ্ছে পিতৃ-পিতামহের ভ্রান্ত আচার-আচরণের অনুকরণ। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, সর্বাবস্থায় সত্য বলবে। আমানত বিনষ্ট করবে না। বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ ও সহমর্মিতার ব্যবহারকে চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করে রাখবে। রক্তপাত ও সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক অবৈধ করা বিষয়াদি থেকে বিরত থাকবে। অশ্লীলতা ও মিথ্যার নিকটবর্তী হবে না। এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না। কোনো নিরাপরাধ নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করো না। এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং অর্জিত সম্পদ থেকে অসহায়-গরিবকে অংশ দাও।

মহান বাদশাহ, ওই নবী আমাদের এ ধরনের আরো অনেক ভালো বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন। আমরা তাঁর প্রতিটি বাক্য পরমসত্য বলে গ্রহণ করেছি। তাঁকে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিয়েছি। তিনি যেসব আসমানি আদেশ-নিষেধ আমাদের শুনিয়েছেন, সেসব অনুসরণ করছি।

আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করেছি। সব ধরনের শিরক থেকে তাওবা করেছি। তাঁর নির্দেশিত হালালকে হালাল বলে মেনেছি এবং হারামকে হারাম বলে পরিত্যাগ করেছি।

এতটুকুই আমাদের অপরাধ! এর পরিণতিতে স্বদেশবাসীরা আমাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে চলে আসতে বাধ্য করেছে। আর শেষ পর্যন্ত আমরা আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছি।
তারা আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছে। দ্বীন ইসলাম থেকে ফেরানোর জন্য আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলছে। তারা আমাদেরকে পৌত্তলিকতার পথে ফিরিয়ে নিতে চায়। সমস্ত অনৈতিকতা ও অশ্লীল কাজ যেন আমরা বৈধ মনে করি এটাই তারা চায়"।

আধুনিক জাহেলিয়াত যেভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, ইসলাম প্রতিরোধের জন্য এবং আল্লাহর দ্বীন ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিভিন্ন ন্যাক্কারজনক পন্থা ও উপায় অবলম্বনে এই জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা যেভাবে সক্রিয়, তা কি উপরোক্ত প্রাচীন জাহিলিয়াত থেকে আলাদা কিছু? নব্য জাহিলিয়াত কি কোন অংশে প্রাচীন জাহিলিয়াত থেকে কম করছে? নাকি আল্লাহর পবিত্র শরীয়ত এবং তাতে সন্নিবেশিত তাওহীদুল উলুহিয়াহ ও রুবুবিয়াহ এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করার বাধ্যবাধকতা উঠে গেছে কিংবা এখন তা আর পূর্ববৎ নেই?! শরীয়ত থেকে এক বিঘত পরিমাণ সরে দাঁড়াবারও কি সুযোগ রয়েছে এখন আমাদের? রিসালাত ও ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর চৌদ্দশ বছরের অধিক সময় পার হয়ে গেলেও শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ বা অধিকার কোনটা কি রয়েছে আমাদের?? ইসলামী শরীয়ত কি যুগের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম? সমকালীন নানান সমস্যার সমাধান কি ইসলামে নেই? মানবসভ্যতার ঐতিহাসিক এ পর্যায়ে যখন অর্থব্যবস্থা সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে উন্নয়ন ও আধুনিকতার চরমোৎকর্ষ চলছে, এ অবস্থায় উম্মাহকে যুগোপযোগী নির্দেশনা দিতে কি ইসলাম সমর্থ নয়? প্রাচ্যবিদদের কোলাবোরেটর' এবং ঘাপটি মেরে থাকা গুজব রটনাকারী গোষ্ঠী তো এসবই প্রচার করে চলেছে। তারা যেন বলতে চায়, এই শরীয়ত অস্থায়ী মেয়াদে একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের জন্য এসেছিল; মানবজাতির কল্যাণের জন্য এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও শরীয়তের আলোকে সারা বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য এই ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ধর্ম নয়। অথচ কুরআনে কারীমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া আছে—

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

অর্থঃ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [সুরা মায়েদা, আয়াত-৩]

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তিনি তাঁর দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। তিনি নিজের নেয়ামত পরিপূর্ণ করেছেন। পুরোপুরিভাবেই তিনি নিজ বান্দাদেরকে তাঁর নেয়ামত দান করেছেন। তাই ইসলামের পর অন্য কোন ধর্ম সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। আল্লাহর শরীয়ত ও হেদায়াতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ লাভের পরে অন্য কোনো নেয়ামত তার চেয়ে বড় হতে পারেনা।

ইসলাম পূর্ব সময়ে মানবজাতি কেমন অবস্থার ভেতর বসবাস করছিল, কোরআনে কারিম ও হাদীসে নববীর আলোকে আমরা যদি সেদিকে দৃষ্টিপাত করি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে যেই জাহিলিয়াত, পশ্চাৎপদতা এবং নেতৃত্ব, চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা

শরীয়ত থেকে এক বিঘত পরিমাণ সরে দাঁড়াবারও কি সুযোগ রয়েছে এখন আমাদের? রিসালাত ও ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর চৌদ্দশ বছরের অধিক সময় পার হয়ে গেলেও শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ বা অধিকার কোনটা কি রয়েছে আমাদের??

ও ব্যবহারিক জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে যে ভয়ানক বিপর্যয় নেমে এসেছিল, মানবতা যেভাবে পশুত্বের বেদীতে বলি হয়ে গিয়েছিল, সে চিত্র যদি আমরা সামনে আনি, আর সেইসঙ্গে অধঃপতিত সেই সমাজ ও বিশ্বে সাহাবা রাযিয়াল্লহু আনহুম ও তাবেঈন যেই পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সেদিকেও যদি আমরা দৃষ্টি ফেরাই; অগ্রসর হয়ে যদি আমরা আরো দেখি, খেলাফতে ইসলামিয়া কিভাবে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কাফের ও তাগুত গোষ্ঠী কিভাবে একে নিজেদের গ্রাসে পরিণত করল; আমরা যদি আরও লক্ষ্য করি, ইসলাম পূর্ব সময়ে সংঘাত বিক্ষুব্ধ বাস্তবতাকে মুসলমানরা কীভাবে পরিবর্তিত করে ফেলতে সক্ষম হলো, কিভাবে গাইরুল্লাহর দাসত্ব থেকে মানবতাকে তারা মুক্ত করল, যথাসম্ভব স্বল্পতম রক্তপাতে কিভাবে তারা পৃথিবীর বুকে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারল; আমরা যদি খোঁজ করি, ইসলাম-পূর্ব সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলোর স্বৈরাচারী নীতি-আদর্শ পাশ কাটিয়ে মুসলমানরা কিভাবে বিশ্বজয় করতে সক্ষম হল, তদানীন্তন ইসলামের প্রতিপক্ষ পরাশক্তিগুলোকে মুসলমানরা কিভাবে মোকাবেলা করল, পারস্য ও রোমের মতো তাগুতি সাম্রাজ্যগুলো কিভাবে মানব জাতির উপর মানুষের দাসত্ব চাপিয়ে দিল, কিভাবে তারা মানবজাতিকে বহুধা বিভক্ত করে দিল, বল খাটিয়ে কিভাবে তারা জনসাধারণকে নিজেদের দাসে পরিণত করল, দেশ জয়ের নামে কিভাবে তারা লক্ষ কোটি মানুষকে হত্যা করল, কত শহর, নগর, কত সভ্যতা ও লৌকিক সংস্কৃতির তারা ধ্বংস সাধন করলো, যা কেবল আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন! এতসব কিছু যদি আমরা বিচার ও পর্যালোচনা করি তবেই প্রাচীন জাহিলিয়াতের সঙ্গে চলমান জাহিলিয়াতের যোগসূত্র ও সাযুজ্য আমরা খুঁজে পাবো।

আমরা জানি প্রাচীন সেই জাহেলিয়াত মোকাবেলায় চাইলেই মুসলমানরা পুরোপুরি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় শত্রু পক্ষের সঙ্গে ঠিক সে আচরণ করতে পারত, যেটা তারা অন্যদের সঙ্গে করে এসেছে। মুসলমানরা চাইলেই ক্রুসেডার ও মুশরিকদের রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে পারতো, কারণ মুসলমানদের সঙ্গে তারা তো এমনটাই করেছিল। তারা মুসলমানদের হাঁটু রক্তে পা ডুবিয়ে যুদ্ধ শেষ করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা সেভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়নি; বরং তীরের জবাব তারা ফুলের মাধ্যমে দিয়েছে। তারা সাধারণ যোদ্ধাদেরকে, বিশেষত দুর্বল নারী ও শিশু, শত্রুপক্ষের বেসামরিক আলেমদের, পাদ্রী ও ধর্মযাজকদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে। যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, যারা নিজেদের গির্জা ও ইবাদত খানায় ইবাদতে মগ্ন ছিল, মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের টার্গেট বানায়নি।

এভাবেই যখন মুসলমানরা কোন রাজ্য জয় করেছে, তখন তারা সেখানে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা অনুযায়ী জাতী ও সমাজ গঠনের চেষ্টায় রত হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা, বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র, তার বাহ্যিক রূপ সৌন্দর্যের নিগূঢ় রহস্য অনুধাবন, সৃষ্টি জগতের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শন থেকে প্রজ্ঞা অর্জন, সেসব দেখে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীবাসীর উপকারে বিভিন্ন শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্মাণ—এই সবই ছিল মুসলিম কীর্তি। মুসলমানরা কেবল ইসলামী ফিকহ-এর বিধি-বিধান, ব্যবহারিক জীবনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাগত বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রেই অবদান রাখে নি, বরং প্রথম তিন শতাব্দি অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে অধিকাংশ মুসলিম আলেম শরিয়া বিষয়াবলীর পাশাপাশি আরো বিভিন্ন বিষয় ও শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তারা সমাজবিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, স্থাপত্য শিল্প, কৃষিবিজ্ঞান, সমর বিজ্ঞানের মত কারিগরি ও আর্থবৈষয়িক শাস্ত্রগুলোতে বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদের সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এসব শাস্ত্রে তারা অনেক মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক যত শাখা ও বিষয়কে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে ধরা যায়, সবগুলোতেই মুসলিম বিজ্ঞানীরা অবদান রেখেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রীয় এমন কোন অঙ্গন তারা অবশিষ্ট রাখেননি, যার গভীরে তারা ডুব দেন নি। তারা পূর্ববর্তীদের রচনার অনুবাদ করেছেন, তাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রকে যুগোপযোগী করে তুলেছেন। এভাবে প্রথম সারির মুসলিম বিজ্ঞানী ও আলেমদের ধারা অনুসরণ করে তাদের পরবর্তীরা এমন সব রচনা কীর্তি বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন, যেগুলো দেখে হয়রান হয়ে যেতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ আল্লামা ইবনে আকীল রচিত ‘কিতাবুল ফুনূন’ ইসলামের ইতিহাসে এবং খুব সম্ভব বিশ্বের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। গোটা ৮০ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থ। তাঁর শিষ্য ইবনুল জাওযী স্বহস্তে দু’হাজার পুস্তক লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে ছয় শতাধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। সেসব গ্রন্থের মধ্যে ১৫ থেকে ১৬ পৃষ্ঠার ফর্মা বিশিষ্ট পুস্তিকা থেকে শুরু করে ২০ খণ্ডের সুবৃহৎ গ্রন্থ রয়েছে। তখন থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোল শাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের রচনা ও গ্রন্থগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে অধ্যায়ন করা হয়। আজও ইবনে সিনা, ফারাবী, ইদ্রিসী, ইবনে নাফিস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নাম কালের বাতাসে অনুরণিত হয়। সর্বত্র শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে এবং প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের নাম উচ্চারিত হয়। এসবের মধ্যে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমরা বুঝতে পারি,আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সাইয়েদেনা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে দ্বীন ইসলাম আঁকড়ে ধরার বরকতেই এই সব কিছু সম্ভবপর হয়েছে।

কোরআনে কারিম মনুষ্যত্ব বিহীন জনগোষ্ঠীকে সোনালী মানবে পরিণত করেছে। কোরআনের নির্দেশনা এবং মহান এই গ্রন্থ থেকে উৎসারিত শরীয়তের বিধি-বিধান তাদের জীবনকে পরিচালনা করেছে। তখন অল্প কয়েক বছরেই সংঘাত বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে শান্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এক কালে যারা ছিল জগতের সবচেয়ে অজ্ঞ অশিক্ষিত ও মূর্খ, ইসলামের আবির্ভাবের পর তারাই মানবজাতিকে সভ্যতার সবক দিয়েছে। পশ্চাৎপদ মানুষগুলোই বিশ্ববাসীকে সত্যিকারের প্রগতিশীল হতে শিখিয়েছে। ইতিহাসের পাতায় যুগান্তকারী কালজয়ী সভ্যতা তাদের হাতে নির্মিত হয়েছে। আমার মনে হয় ইসলাম-পূর্ব অন্যান্য সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে ইসলামী সভ্যতার ব্যতিক্রমী চরিত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কারণ মুসলমানেরা যখন কোন রাজ্য অধিকার করেছে, তথাকার সবকিছু যখন তাদের পদানত হয়েছে, তখন তারা সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দেয়নি, তাদের সৃজনশীলতার মধ্যবিন্দু তারা পিষে ফেলেনি, জ্ঞানীগুণী লোকদেরকে ধরে ধরে হত্যা করেনি, ধর্মের হর্তাকর্তাদের স্বৈরাচারী অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে সৃজনশীল ও বিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের কারণে ধর্মান্ধরা বিজ্ঞানীদেরকে পুড়িয়ে মারেনি। কোন জাতিগোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারলে তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সন্নিবেশিত গ্রন্থাবলী ও গ্রন্থাগারগুলোতে অগ্নিসংযোগ করা হয়নি। বরং মুসলিম শাসকরা তো শিল্প সংস্কৃতি ও জ্ঞান গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, যেন সেগুলো সর্বোচ্চ মানে উন্নীত হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের কল্যাণে কাজে লাগে।

এক কালে যারা ছিল জগতের সবচেয়ে অজ্ঞ অশিক্ষিত ও মূর্খ, ইসলামের আবির্ভাবের পর তারাই মানবজাতিকে সভ্যতার সবক দিয়েছে। পশ্চাতপদ মানুষগুলোই বিশ্ববাসীকে সত্যিকারের প্রগতিশীল হতে শিখিয়েছে। ইতিহাসের পাতায় যুগান্তকারী কালজয়ী সভ্যতা তাদের হাতে নির্মিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে এদিকে ইঙ্গিত করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ইসলামী আন্দালুসের স্বর্ণযুগে পাশ্চাত্যের অনেক পাদ্রী ও ধর্মযাজক সেখানে সফর করেছেন। সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা সভ্যতা শিখেছেন। নিজেদের ভাষায় তারা কুরআন শরীফ সহ অন্যান্য আরবী গ্রন্থাদির অনুবাদ করেছেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তারা ওলামায়ে কেরাম এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। বিশেষত ফিলোসফি দর্শন, চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্রে তারা মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাছে ঋণী। খ্রিস্টান এই পাদ্রীরা নিজেদের দেশে ফিরে আরবি ভাষায় লিখিত সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এ ভাষার প্রসিদ্ধ আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের রচনাবলী পাঠদান করেছেন। আরবি ভাষায় জ্ঞান চর্চার জন্য তখন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, বাদওয়ে এরাবিক মাদ্রাসা। তখন পাশ্চাত্যের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো আরবী গ্রন্থাদির ল্যাটিন সংস্করণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে। তদানীন্তন ইউরোপে ল্যাটিন ভাষা ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধান ভাষা।

বরাবরই প্রতীচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরবী গ্রন্থাদি থেকে তাদের শিক্ষার ধারা চালু রাখে। প্রায় ছয় শতাব্দিকাল পর্যন্ত শিক্ষার প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে তারা আরবি ভাষার গ্রন্থাদিকে। আমরা বলছিলাম যে, মুসলমানরা বিজিত অঞ্চলের জনসাধারণকে দাসে পরিণত করেনি। জনগণের মধ্যে যারা উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা পাবন্দি করে চলবে, ইসলামের শত্রুদেরকে সহায়তা না করবে, ইসলামী সমাজের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করবে, নিজেদের ধর্মের একান্ত নিজস্ব রীতিনীতি ও প্রতীকের প্রকাশ না ঘটাবে, নিজেদের ধর্মীয় বিষয়াদি প্রকাশের মাধ্যমে অন্যদেরকে ফেতনায় না ফেলবে, মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মীয়ভাবে তাদের হামবড়াই ভাব না দেখাবে, এমন অমুসলিম নাগরিকদের উপার্জন ও ব্যবহারিক জীবনে মুসলমানরা কখনোই হস্তক্ষেপ করে না। বরং মুসলমানেরা এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে যে, তাদের আযাদকৃত গোলামদের বিরাট অংশ বড় বড় আলেম, জ্ঞানতাপস, ইসলামী আইন বিশারদ, পূণ্যবান বড় বড় সমাজ সেবক হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে নিজেদের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মুসলিম শাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটি অংশজুড়ে রয়েছে মামলুক (আজাদ ক্রীতদাস) সুলতানদের শাসন কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের গল্প।

সম্ভবত অত্যাশ্চর্যজনক বিষয় হলো, এই যে আজ বস্তুবাদী সভ্যতার অগ্রগতি চলছে, শিক্ষাদিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তা-দর্শন, সাহিত্য-সাংবাদিকতা সর্বক্ষেত্রেই মানব সমাজ যে বিপুল উৎকর্ষ ও উন্নয়ন লাভ করেছে, মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই যে এত প্রযুক্তি ও আধুনিকতা উদ্ভাবিত হয়েছে, এর মাঝেও আজ একবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পৌত্তলিকতা ও পাথর পূজায় লিপ্ত। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা শয়তান পূজারীদের এবং প্রায় শত কোটি মানুষের পূর্ববৎ বিপথগামিতার কথা তো বাদই দিলাম। দলিল হুজ্জত কায়েম হয়ে যাওয়া, বিভ্রান্ত লোকগুলোর প্রতারণা ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলোর বিকৃতির কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিরাটি জনগোষ্ঠীর নিজেদের বিভ্রান্তিতে অটল। নিজেদের ধর্মীয় উপাসনালয় ও গির্জাগুলোর অনৈতিকতা অধঃপতন অনিয়ম অনাচার ও বেহায়াপনা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পথে অনড়।

এমনিভাবে কোরআনে বর্ণিত 'মাগদুবি আলাইহিম' অর্থাৎ আল্লাহর ক্রোধে নিমজ্জিত অভিশপ্ত গোষ্ঠীও নিজেদের কুফুরী ও সীমালঙ্ঘনে বরাবরই অবিচল। এই আকীদা-বিশ্বাস তারা আজও পোষণ করে আছে যে, আল্লাহর একমাত্র মনোনীত গোষ্ঠী তারাই। অথচ অকাট্য দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে, তাদের আকিদা বাতিল। আজ এটাই বাস্তবতা যে, জনমানুষ তাদের এই বাতিল ধর্মে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক। তবে কারো অন্তর্চক্ষু যদি অন্ধ হয়, পার্থিব বৈষয়িক লোভ লালসা চরিতার্থ করাই যদি কারো লক্ষ্য হয় তবে তার কথা ভিন্ন। তারা মানব সমাজের কিছু বিচ্ছিন্ন বিকল অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি মনে করি, দ্বীন ইসলাম যে সত্য ধর্ম, একমাত্র এটি যে সর্বশেষ আসমানী ধর্ম, এটি যে রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মনোনীত, তার পক্ষে সর্বাধিক উজ্জ্বল দলিল ও অভ্রান্ত যুক্তি হলো, কালের আবর্তন সত্ত্বেও, মুসলমানদের বিপর্যস্ত অবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীনকে টিকিয়ে রেখেছেন। ফলে তাঁর শাশ্বত গ্রন্থের একটি অক্ষর পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়নি। আজ গোটা মানবজাতির সামনে কোরআনের একটি সূরার মত অপর একটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ ঝুলে আছে। কেয়ামত পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে করে সফল হতে পারবে না। আল্লাহর অবতীর্ণ আয়াতসমূহের কোন একটিতেও যে কোন প্রকারের অসঙ্গতি কেউ বের করতে পারবেনা। আল্লাহর বিধানাবলীর কোনোটাতেই কেউ কোনো ত্রুটি খুঁজে পাবেনা।

তেমনিভাবে পরম্পরাগত সহিহ হাদিস এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের মাঝে আজ পর্যন্ত কোন বিকৃতি সাধিত হয়নি। সহিহ হাদিসের গ্রন্থগুলোতে সবই লিপিবদ্ধ সংকলিত হয়েছে।

এগুলোর গ্রন্থকারগণ তাদের থেকে আরম্ভ করে সাহাবায়ে কেরাম এবং সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্র লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের রচিত গ্রন্থাবলী বড় বড় পাঠাগার ও গবেষণাকেন্দ্রগুলোতে শোভা পাচ্ছে। সেসব গ্রন্থে নবীজির মুখ নিঃসৃত হাদিস বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে। সেসব হাদিসের ওপর আবার বিভিন্ন রকম কাজ হয়েছে। হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বর্ণনা সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। একেকটা বিষয়কে রীতিমতো কাটাছেঁড়া করে তার মর্মমূল বের করে আনা হয়েছে।

করা হয়েছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এগুলোর চর্চাধারা অব্যাহত রয়েছে। অন্য কোন ধর্ম, অন্য কোন গ্রন্থ, অন্য কোন শরীয়তের ইতিহাসে এমন নজির পাওয়া যাবেনা। ইসলামের আগে বা পরে কখনই এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাইতো আজ মানবসভ্যতার জন্য ইসলামী শরীয়তের বড় প্রয়োজন। আজ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়া এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ক তাওহীদের ভারী প্রয়োজন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অসভ্য, বর্বর ও জাহেলী বিশ্বের জন্য ইসলামের যতটা প্রয়োজন ছিল, আজ মানব সভ্যতার জন্য ইসলামী শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে অধিক। কারণ প্রাচীন জাহিলিয়াত একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান জাহিলিয়াতের তুলনায় অনেক নগণ্য।

প্রাচীন জাহেলী ধ্যান-ধারণা ও আকিদা-বিশ্বাসের অপনোদন করা, সেগুলোর বিভ্রান্তি ও অযৌক্তিকতা তুলে ধরা অনেক সহজ ছিল। সে সময়ে জাহেলিয়াতের রক্ষাকারী, চটকদার বক্তব্যের ছলনাকারী এমন অভিশপ্ত শয়তানরা ছিল না, যারা আসমানী বিধিবিধানকে বিকৃত করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারে এবং নিজেদের পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থে আল্লাহর বিধি-বিধানকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

স্ট্র্যাটেজি বিষয়ক কিছু আলোচনা

আবু খালেদ আস-সানআনী

সময়

যুদ্ধের মধ্যে সময় অতি মূল্যবান এবং মৌলিক দুর্মূল্য সম্পদগুলোর একটি। প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধের সঙ্গে বিশেষত জাতীয় প্রতিরোধ যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে এই সময়ের গুরুত্ব অনুধাবনের বিষয়টি আরো বেশি অনুভবযোগ্য। তাই তাড়াহুড়ো, আগ বাড়িয়ে কিছু করাটা কখনো এমন অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হতে পারে যা যুদ্ধের ইতিবাচক ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দেয়। একইভাবে কখনো ধীরতা ও সময়ক্ষেপণের কারণেও এমনটা হতে পারে। জাতিগত লড়াইগুলো একটু বিশেষভাবে খুব বেশি সময়-নির্ভর; বিভিন্ন মাপকাঠি ও তুলাদণ্ডে এককালীন বন্টনে পরিবর্তন সাধনের মূল উপাদান হলো এই সময়। আক্রমণ, প্রতিরোধ, শত্রুর জন্য ওত পেতে ঘাঁটিতে অবস্থান, এ জাতীয় আরো যত সামরিক ব্যাপার রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কোনটি কখন পালনীয় এবং কখন একটি থেকে অপরটিতে যেতে হবে, সে সময়টা যদি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়, তবে জাতিগত লড়াই-শাস্ত্রে সেটাই হলো সাফল্যের মূল চাবিকাঠি যদি কি-না যথা সময়ে সঠিকভাবে তা সম্পন্ন করা হয়। রাজনীতি ও যুদ্ধ— উভয় ক্ষেত্রে রয়েছে এগিয়ে যাওয়া এবং পিছিয়ে আসার মত দুটো গুরুত্বপূর্ণ দ্বিমুখী সিদ্ধান্ত। একেক সময় একেকটি উপযুক্ত। উভয়টিই ফলপ্রসূ হতে পারে যদি সময়োচিত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা যায়।

শেষ বাক্যটি বোঝাটা অনেক সূক্ষ্ম বিবেচনার দাবি রাখে। রাজনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যেমন কিছু গ্রহণ করা, প্রত্যাখ্যান করা অথবা বিলম্ব ও সময়ক্ষেপণ করার ব্যাপার রয়েছে, একইভাবে সামরিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কখনো আগবাড়িয়ে আক্রমণ করা, কখনও পিছিয়ে আসা আর কখনো শত্রুর জন্য ঘাপটি মেরে থাকার মত তিনটি ব্যাপার রয়েছে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপশনগুলোর মধ্যে উপযুক্তটি বেছে নেয়াই হলো মূল কথা।

একইভাবে আরেকটি ক্ষেত্র হলো যুগপৎ রাজনৈতিক ও সামরিক। এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট অপশনগুলোর মধ্যে উপযুক্তটি বেছে নিতে পারলে সাফল্যের প্রবল আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়। এই কাজ এমন নেতার পক্ষেই করা সম্ভব, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিক প্রাপ্ত এবং যার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো পারস্পরিক মতামত আদান-প্রদান ও পরামর্শের দ্বারা সমৃদ্ধ।

সে ব্যক্তিকে হতে হবে নিজের সামর্থ্য এবং শত্রুর সক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। সঠিক সময় নির্বাচন আর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ উভয়টির মাঝে যদি সুনিপুণভাবে সমন্বয় সাধন করা যায়, সর্বোপরি আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি তাওফিক প্রাপ্ত হয়, সেইসঙ্গে নিজ পক্ষের সামর্থ্য ও দুর্বলতার দিকগুলো এবং শত্রুপক্ষের সামর্থ্য ও দুর্বলতাগুলো যদি তার কাছে চিহ্নিত থাকে, ভূমি, সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, কূটনৈতিক সম্পর্ক ও শত্রু মিত্র নির্ধারণসহ এ জাতীয় অন্যান্য রাজনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রের তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকরী সম্ভাবনা ও শক্তির উপস্থিতি অনুপস্থিতির বিচার ক্ষমতা যদি সে ব্যক্তির থাকে—উপরোক্ত বিষয়গুলোর সম্মিলন নিশ্চিত করে— এককথায় উপযুক্ত সময়ে যদি উপযুক্ত সবকিছু ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করা যায়, তবে সাফল্য অনিবার্য। কারণ এখন যে বিষয়টি সাফল্যের চাবিকাঠি বলে প্রমাণিত তা কিছু সময় পর আর সেই অবস্থায় নাও থাকতে পারে। আর জাতিগত লড়াইগুলোতে এমন কোন সময় নির্ধারিত থাকে না যে, এসময়ে লড়াই শুরু হবে আর এ সময়ে লড়াই শেষ হবে। তাই প্রতিটি অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কোন লড়াই কয়েক মাস দীর্ঘায়িত হতে পারে। আবার কোন লড়াই কয়েক দশক যাবত দীর্ঘায়িত হতে পারে। কোন লড়াই কতটুকু সময় দীর্ঘায়িত হবে তা অনেকটা নির্ভর করে বিবদমান পক্ষগুলোর ইচ্ছা ও লক্ষ্যের ওপর। যদিও প্রেক্ষাপট পারিপার্শ্বিকতা ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কারণে কদাচিৎ লড়াইয়ের মেয়াদকাল কমবেশি হতে পারে, কিন্তু মূল কারণ প্রথমটাই। বিবদমান পক্ষগুলোর বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্য থাকতে পারে।

গুরুত্ব বিবেচনায় প্রথম সারির কিছু লক্ষ্য যেমনঃ রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি, নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা, প্রতিপক্ষের অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎসমুখগুলো বন্ধ করে দেয়া, শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া, ভেতরে বাহিরে শত্রুপক্ষের সমস্ত মিত্রদের সঙ্গে তার দূরত্ব সৃষ্টি করা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা, নিজেদের মিত্র দলগুলোকে একই পতাকাতলে আনয়নের প্রচেষ্টা, নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার লক্ষণগুলো স্পষ্ট করে তোলা, রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপন করা, প্রতিবেশী শক্তিগুলোকে নিয়ে একটি ইতিবাচক অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করা, স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে প্রশাসন গঠন করা এবং সেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব আদান-প্রদানের আবহ ছড়িয়ে দেয়া, জাতীয় দাবি পূরণে সহায়ক ও অঙ্গীকারাবদ্ধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, জনসাধারণের মাঝে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো, বিশেষভাবে জনগণের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া; যখন সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি গোষ্ঠীবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়।

এ বিষয়গুলোকে যদি সুচারুরূপে সমন্বিত করা যায় তবে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক এমন মজবুত বন্ধন হবে যা ভিতরগত বিভিন্ন দল-উপদলের মাঝে আরো গভীর সংশ্লেষ ও সংঘবদ্ধতার বৃদ্ধি করবে। প্রথম পর্যায়ে তো শত্রু রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে সামরিকভাবে ও নিরাপত্তাগতভাবে অনেক শক্তিশালী থাকবে। সে সময় এমন আশা করা অবান্তর হবে যে, একদিন-একরাতের মাঝেই শত্রুর সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। শক্তির দাঁড়িপাল্লায় পূর্ববৎ বন্টন পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি হল এই সময়। সময়ের হাত ধরেই দুর্বল পক্ষ নিজের দাওয়াত প্রচার করে শক্তি সংগঠিত করে

তুলতে পারে। এই সময়ের হাত ধরেই দুর্বল পক্ষ প্রতিপক্ষের রক্তক্ষরণের মাধ্যমে তার শক্তি নিঃশেষিত করে দিতে পারে। এই সময়ের হাত ধরেই দুর্বল পক্ষ অর্থনৈতিকভাবে সবল প্রতিপক্ষের অর্থনীতিতে ধস নামাতে পারে। এই সময়ের সহায়তায়ই দুর্বল পক্ষ প্রতিপক্ষের সামরিক সরঞ্জামাদি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিন্যাস উলটপালট করে দিতে পারে। তখন শত্রুপক্ষের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ফাঁস হয়ে যায়। শ্রেণী নির্বিশেষে তাদের লোকেরাই তাদের ওপর ক্ষেপে যায়। তাদের মাঝে অস্থিতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ মিছিল হতে থাকে। শত্রুপক্ষের পুরো অঞ্চলে এক সময়ে এই বিশৃংখলা ছেয়ে যায়। তখন তার বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হয়। গণ বিপ্লব সৃষ্টি হয়। তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার বাইরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়ে যায়।

তো আমরা দেখতে পেলাম একটি নেজাম ও শক্তিশালী ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টিতে এই সময় কত বড় ভূমিকা রাখে। যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে এই সময় যেমনিভাবে শত্রুর শক্তি নিঃশেষ করে দেয় তেমনি শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তার সদ্ব্যবহারকারীদের জন্য নিজেদেরকে গুছিয়ে নেয়ার এবং নিজের শিবিরে শৃঙ্খলা আনয়নেরও সুযোগ করে দেয়।

এই সময়ই হলো জাতিগত লড়াইগুলোতে ফলাফল নির্ণয়ের নিয়ামক। কোন জাতি যখন আত্মদানের সুধা পান করতে শেখে, স্থূল বাহ্যিক উপকরণ থেকে যখন কার্যকরী উপায়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ধৈর্য ও সন্তুষ্টি সহকারে যখন তারা আদর্শের পথে বিপদ আপদের মুখোমুখি হয়, নিজেদের প্রাণসহ সর্বস্ব যখন আদর্শের পথে বিলিয়ে দেয়, ব্যক্তিগত অহংবোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহার ওপর যখন আদর্শের মান মর্যাদা রক্ষাকে প্রাধান্য দেয়, আর উপরোক্ত কাজগুলো মুসলিম জাতি হিসেবে ইসলামের জন্য যদি আমরা পালন করতে পারি তবেই আমাদের সাফল্য নিশ্চিত। জাতীয় সংহতি সৃষ্টি দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। মাও সেতুং -এর ভাষায় সাহিত্যভাব সমৃদ্ধ বাক্যে এভাবে বলা যায়—"সময়ের বিকল্পহীন গুরুত্ব বুঝতে হবে। এই সময়ের গুরুত্ব কেবল নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছানুরূপ রাজনৈতিক পট নির্মাণের জন্যই নয়; বরং দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধর দরুন শত্রুর অন্তর্গূঢ় টুকরো টুকরো ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো একত্রিত হয়ে যেন এক বিরাট আকার ধারণ করে, তার জন্যেও সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম।"

মুক্তি সংগ্রাম ও প্রতিরোধ যুদ্ধগুলো ঠেকাবার জন্য আগ্রাসী শত্রু ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলো যে সমস্ত দমন-পীড়ন মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, দিন দিন সেগুলো ভেতরে-বাইরে তাদের সমস্ত মিত্র ও সহযোগী শক্তিগুলোর সঙ্গে তাদের দূরত্বই কেবল বৃদ্ধি করে। শেষ পর্যন্ত তারা একেবারেই একাকী হয়ে চূড়ান্ত পতনের জন্য অপেক্ষমান থাকে। কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অথবা আগ্রাসী বাহিনীর শক্তি ক্ষয়ের জন্য সময়ের গুরুত্ব এমনই অপরিসীম। অপরদিকে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিশ্বস্ততা, সত্যতা ও আদর্শবাদিতা প্রমাণের জন্যেও আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। এখন সেটা যেকোন ধরনের বিপ্লব হোক না কেন; চাই নিরস্ত্র বিক্ষোভ আন্দোলন হোক কিংবা সশস্ত্র বিপ্লব, চাই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হোক কিংবা সামরিক অভ্যুত্থান। সময়ই বলে দেবে, যে লক্ষ্য ও আদর্শ সামনে রেখে আন্দোলন দাঁড়িয়েছে, কালের আবর্তনে সে আদর্শের ওপর আন্দোলন কতটুকু টিকে থাকতে পেরেছে। বিভিন্ন কারণে এমনটা হতে পারে যা আমাদের এখানে আলোচ্য নয়।

"সময়ের বিকল্পহীন গুরুত্ব বুঝতে হবে। এই সময়ের গুরুত্ব কেবল নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছানুরূপ রাজনৈতিক পট নির্মাণের জন্যই নয়; বরং দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধর দরুন শত্রুর অন্তর্গূঢ় টুকরো টুকরো ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো একত্রিত হয়ে যেন এক বিরাট আকার ধারণ করে, তার জন্যেও সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম।"

তবে আমরা এখানে গুরুত্বারোপ করছি যে বিষয়ের ওপর তা হলো, বিপ্লবের ক্ষেত্রে সময়ের অবদানের কথা এবং এই সময়ের হাত ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা। বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দেখা গেছে, তারা বিপ্লব সফল করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন কিন্তু একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে কিংবা তার কিছু আগে হঠাৎ প্রতিপক্ষ এমন কিছু প্রলোভনের টোপ ফেলে যা আগেও তারা ফেলেছিল। তারচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, একসময়ের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সেই টোপগুলো গিলে ফেলে শত্রুর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা থেকে পিছিয়ে আসতে থাকেন। শত্রুকেই তখন মিত্র হিসেবে তাদের মনে হতে থাকে। কখনো তো সেই বড় শত্রুকে বিচারক মেনে নিয়ে শাখাগত বিষয়ে তুলনামূলক ছোট প্রতিপক্ষদের সঙ্গে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য সেই বড় শত্রুদেরই শরণাপন্ন হয়ে যান।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, একসময়ের প্রতিপক্ষ ও শত্রুদলের পতাকা তলেই আশ্রয় গ্রহণ করে তারা স্বস্তি পান। আবার কখনো কোন আন্দোলনের বেলায় কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। আন্দোলনের মাঝামাঝি পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের আক্রোশ ও জিঘাংসা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন আর কেবল শাসক মহলের প্রতি সে আক্রোশ সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তা বৃদ্ধি পেয়ে জনসাধারণের প্রতিও শত্রুতার মনোবৃত্তি তৈরি হয়। সে আন্দোলন যখন পথ চলতে শুরু করে, তখন জনসাধারণের প্রতি শত্রুতা ও জিঘাংসা নিয়েই কর্মসূচি নির্ধারণ করে। জনসাধারণের চিন্তা সব সময় তাকে বিচলিত করে। শাসক মহলের পাশাপাশি জনমানুষকে তারা হুমকি ভাবতে শুরু করে। তখন দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, তাদের অস্ত্রের আঘাত জনসাধারণ আর শাসক মহলের মাঝে কোন পার্থক্য করছে না।

এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলে বৈপ্লবিক আন্দোলন কখনো পিছিয়ে আসে না সে কথা ঠিক কিন্তু তার মাঝে বিকৃতি সাধিত হয়ে যায়। পরিবর্তন সাধনের মহৎ লক্ষ্য প্রতিশোধ গ্রহণের বিক্ষুব্ধ তাড়নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এমন আন্দোলন তার ভবিষ্যৎ হারিয়ে ফেলে। আবার কিছু কিছু আন্দোলনের অবস্থা হল, প্রথম অবস্থা থেকেই প্রতিপক্ষ রাজশক্তি নিজেদের একটি দাবি মেনে নিতে আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। পরোক্ষভাবে তাদেরকে বাধ্য করে। একপর্যায়ে আন্দোলন রাষ্ট্রশক্তির সে দাবি মেনে নিয়ে ক্ষমতা বাগানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত নিছক একটি রাজনৈতিক দলের রূপ পরিগ্রহ করে। এ পর্যায়ে কখনো কখনো পুরো আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ে অথবা তাদের মাঝে দ্বিধাবিভক্তি এসে যায়। কখনো প্রতিষ্ঠাতা মূল ব্যক্তিরাই আন্দোলন থেকে সরে আসেন। আবার কখনো তারা দলের আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু চিন্তা করেন। কোন কোন আন্দোলন নিজ পরিকল্পনামাফিক কিছুটা সাফল্য পেয়ে রাজশক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে সক্ষম হয়।

প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্যের শীর্ষে তারা পৌঁছে যায়। কিন্তু তারপরেই একে একে নিজেদের আদর্শ থেকে পিছিয়ে আসতে শুরু করে। সে সময় তারা নিজেদের অর্জন ও প্রাপ্তিগুলো ধরে রাখার জন্য আদর্শের ব্যাপারে ছাড় দিতে আরম্ভ করে। সুবিধাসমূহ রক্ষার জন্য যদি তাদেরকে কর্মীদের এক নদী রক্ত-ঘাম বিসর্জনের বিনিময়ে অর্জিত ভূমির অর্ধেকও ছেড়ে দিতে হয়, তবুও তাতে তারা কোনো পরোয়া করে না। আবার কোন কোন আন্দোলনের পরিণতি এমন হয় যে, তারা শাসনক্ষমতা দখল করে সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর যখন সে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের মূল আদর্শও দাফন হয়ে যায়। যুগের হাওয়া গায়ে লেগে আন্দোলনের নতুন কর্মীদের মাঝে তখন সমকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক ধ্যানধারণা বাসা বাঁধতে শুরু করে। সে অনুযায়ী তারা কাজ চালিয়ে যায়।

যে আদর্শ ও লক্ষ্য সামনে রেখে আন্দোলন দাঁড়িয়েছিল তা ক্রমেই তাদের চিন্তাজগত থেকে মুছে যায়। একসময়ের মৌলিক আকিদাও তারা হারিয়ে ফেলে।

তো আমরা দেখতে পেলাম যেমনিভাবে শত্রুপক্ষের শক্তি নিঃশেষ করার ক্ষেত্রে সময়ের ইতিবাচক অবদান রয়েছে তেমনিভাবে এই সময়ের স্রোতেই আন্দোলনের আদর্শ ও মূল সত্য হারিয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে। তাই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি, আদর্শ থেকে সরে আসা,মূল সত্য বিকৃত হয়ে যাওয়া এবং এ বিষয়গুলো থেকে সৃষ্ট আরো যা কিছু রয়েছে,

সবই এমন স্পর্শকাতর তাৎপর্যপূর্ণ এক বিষয়, যার সঠিক অবস্থা কেবল সময়ই বলে দিতে পারে। আন্দোলনকারীদের পথচলার মেয়াদকাল, চাই সেটা সংক্ষিপ্ত হোক কিংবা দীর্ঘ, সেটাই আন্দোলনকে বিচার করে বলে দেয় তার সাফল্য বা ব্যর্থতা। কিন্তু এখানে একটি ব্যাপার আছে। কোন আন্দোলন নতুন করে দাঁড়াবার পর সময়ের আবর্তনে তার মাঝে কতটা পরিবর্তন বিচ্যুতি ও বিকৃতি আসবে তা কি আমরা আগে থেকে বলে দিতে পারি? সেটা বলা কী আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে? এর জবাবে এ কথাই বলতে হবে: ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন তিনি একমাত্র চিরঞ্জীব। তিনি যখন যা ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারেন কিন্তু তিনি নিজে কখনোই পরিবর্তন হবার নন।

আরেকটি পয়েন্ট এ পর্যায়ে এখানে বৃদ্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে এ পয়েন্টটি সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। তাদের কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাদের মনোবল চাঙ্গা করবে। সেই পয়েন্ট আমরা এভাবে আলোচনা করতে পারি যে, আমাদের কাজ হল ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে বের করে এনে আলোকোজ্জ্বল রাজপথে তুলবার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা করা। এখন আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যাবসায় ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার তাৎক্ষণিক কিংবা ভবিষ্যৎ-ফলাফল কী দাঁড়াবে, তা মহান আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করবেন।

তিনি এরশাদ করেন—

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

অর্থঃ বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে (সূরা আলে ইমরান: ১২৬)

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন—

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী হেকমত ওয়ালা। (সূরা আল আনফাল: ১০)

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে কামনা করি, যেন তিনি তাঁর মুজাহিদ বান্দাদেরকে তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করার, তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হবার, তাঁর শত্রুদের দর্প চূর্ণ করার, তাঁর বান্দাদের জন্য হেদায়েতের আলোকোজ্জ্বল রাজপথ নির্মাণ করার তৌফিক দান করেন।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন: হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيًّا ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، ثُمَّ سَكَتَ

"তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর আল্লাহ্ তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যতের আদলে (খোলাফায়ে রাশিদীণ) খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে বংশের (উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় খিলাফাত) শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এক সময় আল্লাহ্'র ইচ্ছায় এরও অবসান ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত -নবুয়্যতের আদলে। অতঃপর তিনি নীরব হয়ে যান"।

দুই মুজাদ্দিদ: উসামা বিন লাদেন ও আযযাম: পরস্পর সাংঘর্ষিক, নাকি ভিন্নধর্মী!

“আধুনিক জিহাদের দু’টি ধারা: বিন লাদেন ও আযযাম” - শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের উপর কিছু আপত্তি

তৃতীয় আসর

উভয় শায়খের দৃষ্টিতে বৈশ্বিক জিহাদ

খাত্তাব বিন মুহাম্মদ আল-হাশিমী

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক নির্বাচিত রাসূল হাবিবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবা আজমাঈন এবং হেদায়েতের পথে উৎসর্গিত আইম্মায়ে দ্বীনের উপর।

হামদ ও সালাতের পর...
দ্বিতীয় পর্বে সম্মানিত পাঠকদের কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম, তৃতীয় পর্বে বিশেষভাবে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আর তা হল, উভয় শায়খের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সমকালীন বৈশ্বিক জিহাদ।

আল্লাহ তায়ালা উভয়কে কবুল করুন। পাঠকদের কাছে আরও ওয়াদা করেছিলাম, *"আধুনিক জিহাদের দু'টি ধারা: বিন লাদেন ও আযযাম"* নামক প্রবন্ধ সিরিজের প্রবন্ধকারের বিভিন্ন ভুল ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করবো। তিনি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি জাত জিহাদি রূপরেখাকে ভিন্ন ভিন্ন দুটি নাম দিয়েছেন। একটি হল পারস্পরিক সহযোগিতার মানহাজে জিহাদ আর অপরটি হল স্বতন্ত্রতা ও গেরিলা পন্থার জিহাদ। লেখক সেই সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে ইসলামী জামাতগুলোর ব্যাপারে এবং তাদের সঙ্গে আচরণবিধি ও যোগাযোগের নীতিমালার প্রশ্নে উভয় শাইখের অবস্থান তুলে ধরেছেন। লেখকের বক্তব্য খণ্ডনের জন্য আমি একেবারে শুরু থেকে আরম্ভ করেছি। এ কারণে লেখক উভয় শাইখের মধ্যকার চিন্তার ভিন্নতা আলোচনা করতে গিয়ে যে পাঁচটি বিষয়ে তাদের মাঝে বড় রকম মতভিন্নতা তিনি পয়েন্ট আকারে তুলে ধরেছেন এবং যেগুলোর উপর তিনি শিরোনাম লাগিয়েছেন—*"সর্বাধিক অনুভবযোগ্য এবং বিরাট মতভেদপূর্ণ পাঁচটি ক্ষেত্র"*—তারই একটি নিয়ে আলোচনাকালে লেখক মহোদয় (আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করুন!) যে বক্তব্য রেখেছেন, এ পর্যায়ে তা নিয়ে আমি আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

> লেখক মহোদয় বলেছেন: "শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম জিহাদের যে মানহাজ গ্রহণ করেছেন তার নাম দেয়া যায় 'জিহাদুল মুনাসাহ' অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে রচিত মানহাজ।"

লেখক মহোদয় এই পরিভাষাটি নিজেই উদ্ভাবন করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি ইবনে লাদেনের মানহাজের নাম দিয়েছেন *'জিহাদ আল মুহাজারা' অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা অবলম্বিত মানহাজ*। তো যাই হোক না কেন আমি সিরিজের এই অংশে এবং পরবর্তী আরো কয়েকটি পর্বে লেখকের এ জাতীয় বক্তব্যের অপনোদনে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ! এতে করে লেখক মহোদয়ের দেখানো পাঁচ ক্ষেত্রে উভয় শায়েখের মাঝে বাস্তবেই কতটুকু মতভিন্নতা ও মতভেদ রয়েছে তা পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তারা উপলব্ধি করতে পারবেন, লেখক মহোদয় যেমনটা বলেছেন যে, এই পাঁচটি ক্ষেত্র হলো উভয় শাইখের চিন্তাগত ভিন্নতার বিরাট এক আয়তন—আসলেই তা কতটুকু বাস্তব? আমার আলোচনা থেকে ইনশাআল্লাহ পাঠকদের সামনে এই বাস্তবতা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যে, উভয় শায়খের রেখে যাওয়া মেহনতের নমুনা এবং তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও সংগ্রামের সদ্য প্রকাশিত ও ক্রম প্রকাশমান সুখময় ফলাফল গভীরভাবে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণকারী যে কারো কাছে উভয় শাইখের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন ভিন্নতা থাকতে পারে না।

ষষ্ঠ মূল্যায়ন: প্রসঙ্গঃ বৈশ্বিক জিহাদঃ নেতৃত্ব ও নীতি নির্ধারণ

লেখক মহোদয় তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, ইমাম আব্দুল্লাহ আযযামের অবস্থান হচ্ছে, যে ভূমিতে জিহাদ প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানকার অধিবাসীরাই সেখানে জিহাদ পরিচালনা, উপযুক্ততা-অনুপযুক্ততা নির্ণয়, যুদ্ধের ঘাঁটি নির্বাচন ইত্যাকার বিষয়ে অধিক পারদর্শী, ওয়াকিফহাল ও সমঝদার হয়ে থাকে। একারণে মূলত তারাই নেতৃত্ব লাভের অধিক হকদার। এমতাবস্থায় যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে তাদের দায়িত্ব হবে, স্থানীয় মুজাহিদদের নির্দেশনা মতে শুধু কাজ করে যাওয়া। এই আলোচনারই ধারাবাহিকতায় লেখকের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"বিভিন্ন ইসলামী ভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর নানা প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতিমালা নির্ধারণ এবং এ লক্ষ্যে ইতিবাচক করণীয় রচনায় আব্দুল্লাহ আযযাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি জিহাদি কর্মসূচিতে প্রধানত এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, জনসমর্থন, লজিস্টিক সাপোর্ট ও সামরিক শক্তি (স্বেচ্ছাকর্মী মুজাহিদ বৃন্দ) ইত্যাদি উপাদানগুলো সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে একত্র বিন্যস্ত করা, আঞ্চলিক প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা ও রাজনৈতিক পলিসি অনুযায়ী সে শক্তি প্রয়োগে অগ্রসর হওয়া; কিন্তু আঞ্চলিক প্রতিটি জেহাদি ময়দানের একান্ত নিজস্ব স্ট্র্যাটেজিক খুঁটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, অন্যান্য মুজাহিদ জামায়াতের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে একীভূত না হওয়া, যদিও প্রতিটি জামাতকে এক সারি ও প্লাটফর্মে নিয়ে আসার প্রয়াস অব্যাহত রাখা, আর সেসব জামাতের নিজস্ব সংঘর্ষ ও লড়াইগুলোতে অংশগ্রহণ গুরুত্বের

সঙ্গে পরিহার করা। জামাতগুলোর সঙ্গে আচরণের এই বিধি যখন আমরা বুঝতে পারলাম তখন আমরা আরো সহজেই একথা বুঝতে পারি, প্রতিটি অঞ্চলের আঞ্চলিক জিহাদী সংগঠনগুলোর লক্ষ্য ও পদক্ষেপের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও মুখোমুখি পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও জিহাদী প্রকল্প রচনা করা কখনোই বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের প্রতি ইমাম আযযামের নির্দেশনা হতে পারে না। ইমাম আব্দুল্লাহ আযযামের এমনই দৃষ্টিভঙ্গিজাত মানহাজ ও জিহাদী কর্মসূচিকে আমরা বলতে পারি — 'পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মানহাজ নির্ভর জিহাদ'।"

লেখক মহোদয়ের বক্তব্য আমরা দেখলাম। এরপর তিনি নিজের মত করে জিহাদি নেতৃত্বের ব্যাপারে ইবনে লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন-

"পক্ষান্তরে ইবনে লাদেন বৈশ্বিক জিহাদ পরিচালনার জন্য বিশেষ পন্থা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন আল-কায়েদার অধীনে থাকাকে। পরিভাষায় আমরা এই পন্থাকে বলতে পারি—'স্বতন্ত্রতা ও বিচ্ছিন্নতার মানহাজ নির্ভর জিহাদ'। বৈশ্বিক জিহাদের এই দ্বিতীয় রূপরেখাটির সঙ্গে প্রথম রূপরেখার পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ দুটো ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ স্বাগতিক রাষ্ট্রের মুজাহিদদের থেকে আলাদা হয়ে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও জিহাদী প্রকল্প রচনা করা। এর দুটো বাস্তব উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। একটি আফগানিস্তানে অপরটি ইরাকে।"

এই ছিল লেখক মহোদয়ের আংশিক বক্তব্য। লেখক মিশরীয় ইনস্টিটিউট ফর স্টাডিজ-এ প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধের একটি সংস্করণে আরো বলেন-

"বৈশ্বিক জিহাদের ব্যাপারে ইবনে লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গী ও পছন্দসই পন্থায় প্রাধাণ্যপ্রাপ্ত বিষয়গুলো হলো, স্পর্শকাতর ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা, বিভিন্ন অভিনব উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা, আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের থেকে পৃথক থেকে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচী ও উদ্যোগ গ্রহণ করা, সংঘর্ষগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। অপরদিকে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম জিহাদের ময়দানের ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত থেকে বের হবার পক্ষপাতী নন। আভ্যন্তরীণ যেকোনো সংঘর্ষ ও যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ পরিহার করতে বলেন তিনি।"

এই হলো আমাদের লেখক মহোদয়ের কিছু অসার দাবি যা তিনি না জেনেই উত্থাপন করেছেন। বিভিন্ন ঘটনার খণ্ডিতাংশ থেকে তিনি এসব দাবি সাজিয়েছেন। মূল ব্যাপারটি যাতে সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে চলে আসে তাই মহান এই দুই ইমামের সংগ্রামী জীবনের সারাংশ আমাদের জানা দরকার। আল্লাহ তাআলা উভয়ের উপর রহমত বর্ষণ করুন! আমরা পিছনের দুই পর্বে তাদের সংগ্রামী জীবনের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পর্বে তাদের নির্মোহ বাস্তব ইতিহাসটুকু নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। তো আমরা জানি, আমাদের প্রিয়ভাজন এই উভয় শায়খ জীবনের একটি অধ্যায় একই সঙ্গে কাটিয়েছেন। পুরো-সময়ে আফগানিস্তানে সেখানকার অধিবাসীদেরকে সাহায্য করার লক্ষ্যে এবং মুসলিম ভূমি থেকে আগ্রাসী শত্রু বিতাড়নে তাদের সহযোগিতার লক্ষ্যে উভয়ে সশরীরে সেখানে হিজরত করার বিষয়ে একেবারেই মতপার্থক্যে লিপ্ত হন নি। এরই ধারাবাহিকতায় আফগান গোত্রগুলোর সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠা ও হেকমতের মধ্য দিয়ে, সে অঞ্চলে জনসমর্থন, লজিস্টিক সাপোর্ট ও সামরিক শক্তি সহযোগের সুচারু সমন্বয়ের মাধ্যমে আফগান ইসলামী প্রতিরোধ সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া এবং বৃহৎ এ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সব রকম উপাদান

ও উপকরণ যোগানোর ক্ষেত্রে উভয়ই চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা বলেছিলাম যে, শায়খ উসামা যখন আফগান গোত্রগুলোর সঙ্গে চলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন, কাছ থেকে যখন গোত্রগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কখনও কখনও তাদের সংঘর্ষের চিত্র দেখলেন, তখন সে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে চেয়েছিলেন, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে আফগান গোত্রগুলোর শক্তি-উপকেন্দ্র ও সেনা শিবিরগুলোর পাশাপাশি আরব মুজাহিদদের জন্য বিশেষভাবে পৃথক কিছু শক্তি-উপকেন্দ্র ও সৈন্য শিবিরের ব্যবস্থা হোক। তাত্ত্বিক পরিসরে নিজস্ব গবেষণা থেকে তখন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম বিন লাদেনের এই চিন্তার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মনে করছিলেন, আফগান ভাইদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য শাইখ ইবনে লাদেনের এমন উদ্যোগ গ্রহণের কোনই প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন শায়খ উসামা এবং তাঁর আরব সহচররা জাজির প্রসিদ্ধ যুদ্ধে শায়খ উসামা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মাসাদাতুল আনসার' ঘাঁটিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে রুশ কমান্ডো বাহিনীকে যখন তারা ন্যক্কারজনক পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেছিলেন, তখনই শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম শায়খ ইবনে লাদেনের সিদ্ধান্তের পক্ষে আশ্বস্ত হয়ে ওঠেন।

তারা উভয়ই তখন ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন, মুহাজির যোদ্ধারা যেমনিভাবে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশ মতে বিভিন্ন সামরিক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকবে, তেমনি সামাজিকভাবেও তাদের একটি আলাদা ও পৃথক অবস্থান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তাদের পক্ষে নিশ্চিত করাও সমান প্রয়োজন। আর মুহাজির যোদ্ধাদের এই শক্তি সংযোগ অবশ্যই আফগান প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সর্বসম্মত রাজনৈতিক পলিসি ও নির্দেশনা মতে কার্যকর হবে। সেই সঙ্গে তাদেরকে একই সারি ও প্লাটফর্মে নিয়ে আসার যথাযোগ্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র শক্তির নিজস্ব সংঘর্ষগুলোতে অন্যদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে কঠোর সর্তকতা অবলম্বন করা হবে। তাহলে আমরা সঠিক ইতিহাস এরকম পাচ্ছি যে, জাজির যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের আগে যেখানে ইমাম আযযাম একরকম দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন, লেখক মহোদয়ের তৈরি পরিভাষায় যা হলো 'পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগের মানহাজ নির্ভর জিহাদ', সেখানে বিজয় অর্জনের পর তিনি তার ছাত্র ইবনে লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন যা লেখক মহোদয়ের ভাষায় স্বতন্ত্রতা ও বিচ্ছিন্নতার মানহাজ নির্ভর জিহাদ। আল্লাহ তাআলা উভয়ের মেহনতকে কবুল করুন আমীন!

> **কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সারাবিশ্বে কুফরি শক্তির আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভের উপায় হচ্ছে গোটা মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের সামরিক সাজে সজ্জিত করা।**

রুশ বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর ইমাম আব্দুল্লাহ আযযাম এবং ইমাম ইবনে লাদেন উভয়েই এই কর্মসূচির ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সারাবিশ্বে কুফরি শক্তির আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভের উপায় হচ্ছে গোটা মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের সামরিক সাজে সজ্জিত করা। কিন্তু এখানে লেখক মহোদয়ের দাবিগুলোর ভেতর থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের ব্যাপারে সতর্ক করা অতি প্রয়োজন। রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইকালে কখনোই আমাদের উভয় শাইখের কারো মনেই স্বাগতিক দেশের স্থানীয় মুজাহিদদের থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র জিহাদী ও রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কথা ঘুণাক্ষরেও আসেনি। ইতিহাস সাক্ষী!

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চলাকালেই শুধু নয় বরং ১৪০৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তখনো কি শাইখ ইবনে লাদেন কি শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম কারো মনে

বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র জিহাদী ও রাজনৈতিক এমন কোনো কর্মসূচির চিন্তা ঘুণাক্ষরেও আসেনি যা আফগান জিহাদের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য, পদক্ষেপ, রাজনৈতিক নির্দেশনা ও কর্ম পলিসির মুখোমুখি বা সাংঘর্ষিক হবে। কিন্তু আফগানিস্তান থেকে যখন রুশ দানব লেজ গুটিয়ে পালাল, সোভিয়েত ইউনিয়নের যখন পতন ঘটল, তাদের লাল পতাকা যখন ভূপাতিত হলো, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নামে পশ্চিম মেরুর ক্ষমতা যখন পাকাপোক্ত হল, কাবুলে জামায়াত ইখওয়ানুল মুসলিমিন ধারার পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলোর মাঝে যখন ভ্রাতৃঘাতী অভ্যন্তরীণ সংঘাত ছড়িয়ে পড়ল, তখন স্বাধীন ইসলামপন্থীদের জন্য একান্ত অনিবার্য ছিল, ক্রুসেডার সংঘের নেতৃত্বাধীন এক মেরু কেন্দ্রিক এই বিশ্বব্যবস্থায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং তদানীন্তন বিভিন্ন ইসলামী ভূখণ্ডে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ যেকোনো ধরনের ফেতনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফাসাদ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখা। মুসলমানদের জন্য আবশ্যকীয় ছিল, ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতে এবং আগ্রাসন কবলিত বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ডের নিপীড়িত মানুষদের সাহায্যের আহ্বানে উদাত্ত কণ্ঠে সাড়া দেয়া।

তাইতো দেখা গেছে, সে সময়ে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম বিভিন্ন লেকচারে, বয়ানে, বক্তৃতায় এবং তালিমের মজলিসে বিশেষত শাহাদাতের দু'বছর আগে তাঁর জীবনের একেবারে শেষ দিকের ইলমি মজলিসগুলোতে উদাত্ত কণ্ঠে মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ঘোষণা উচ্চারণ করেছিলেন। 'আয-যাখাঈরুল ইযাম' নামে সংকলিত শায়েখের শেষ দিকের বিভিন্ন অডিও ও ভিডিও লেকচারের ফাইলগুলো যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে দেখেন ও শোনেন, তবে অনায়াসে তার কাছে প্রতীয়মান হয়ে উঠবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠার পরে যুগের নতুন চাহিদা ও দাবি অনুসারে ইসলামিক যুদ্ধের প্রকৃতি উদ্ঘাটন করে এবং সমকালীন বিশ্বের সামরিক বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করে কতটা ব্যতিক্রমী ও নতুন আঙ্গিকে তিনি নিজ জাতির প্রতি তার সম্ভাষণবাণী সাজিয়েছিলেন!

মুসলিম উম্মাহ তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংঘাতসমূহের প্রকৃতি অনুধাবন করতে না পারায় তারা যে কতটা গভীর বিপর্যয়-খাদে নিপতিত হতে চলেছে, গভীর উদ্বেগ সহকারে তিনি জাতিকে তা জানিয়েছেন। তাই এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জায়োনিস্ট ও ক্রুসেডার যৌথ শক্তি ইমাম আব্দুল্লাহ আযযামের যুগোপযোগী ঘোষণার নতুন আঙ্গিক দেখে তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। মুসলিম উম্মাহর চিন্তা ও মননে তাঁর এসব বয়ান বক্তৃতা ও ঘোষণা যে কতটা প্রভাবক ও অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল, কাফের সংঘ খুব ভালোভাবেই তা অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাই তো তারা তাদের মুসলিম নামধারী আমলাদেরকে খুব দ্রুত মহান এই ইমামের পেছনে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে গুপ্তহত্যার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে ফেলতে বলেছিল, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া পরাজয় নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর মুসলিম উম্মাহর মাঝে তাঁর বয়ান ও বক্তৃতাগুলো যুগোপযোগী সংশোধিত নতুন কোন জিহাদি জোয়ার সৃষ্টি না করে। এক পর্যায়ে ঠিকই শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কবুল করে নিন- আমীন! পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষক মহলে অনেকেই শাইখকে গুপ্তহত্যা করার ষড়যন্ত্রে আমেরিকাকে অভিযুক্ত করেন। নিজের অনুগত আমলাদের মাধ্যমে আমেরিকাই যে এ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে, বিশ্লেষণ করে সেটাই তারা বুঝতে পারেন। তাদের মাঝে রয়েছেন সাংবাদিক আহমদ জাইদান।

তিনি একটি প্রবন্ধে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধের শিরোনাম হচ্ছে, "শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম হত্যাকাণ্ড: আফগান জিহাদ বন্ধের পথে একটি পদক্ষেপ"। ১৪১০ হিজরীর শাবান মাসে 'আল বয়ান' ম্যাগাজিনের ২৬ তম সংখ্যায় তিনি প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। ৩০ বছর আগে একটি প্রবন্ধে তিনি যে কথা বলে গেছেন, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় আজ ৩০ বছর পর সেই বক্তব্য সিরিয়ার ভূমির ব্যাপারেও তারচেয়ে সমান প্রাসঙ্গিক। তাই আসুন তা পড়ে দেখা যাক-

"অতি আশ্চর্যের ব্যাপার, গুপ্তহত্যার ঘটনা সংঘটিত হবার কিছু দিন আগে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের

উপপ্রধান পাকিস্তান সফরে আসেন। অথচ এধরনের ব্যক্তিবর্গ খুব কমই পাকিস্তানে এসে থাকেন। পাকিস্তান সফরে সর্বশেষ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কোন সদস্য যিনি আসেন তিনি হলেন উইলিয়াম ক্যাসি। তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের আমলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন। এছাড়াও পেশোয়ারে নিযুক্ত মার্কিন কনস্যুলেট গুপ্তহত্যা সংঘটিত হবার এক মাস আগে শায়খ আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আবেদন নাকচ হয়ে যায়।"

এ পর্যায়ে আমরা শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের শেষ দিককার বক্তব্যগুলো বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় পয়েন্ট আকারে যতটুকু পারা যায় তুলে ধরবো। কারণ ইমাম ইবনে লাদেনের উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে জনমনে তথৈবচ চিন্তাক্ষেত্র ও স্ট্র্যাটেজিক বিন্যাস তৈরিতে শাইখ আবদুল্লাহ্'র সেই বক্তব্যগুলো প্রধান কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। আল-কায়েদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইমাম ইবনে লাদেনের সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দের শ্রম ও মননশীলতায় সমৃদ্ধ এবং রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ইমামের অসাধারণ বিরল প্রতিভা থেকে উৎসারিত সমকালীন বৈশ্বিক জিহাদের যে খসড়া জাতির সামনে এসেছে, তার যথাযোগ্য পূর্ণরূপ সাধন ও বাস্তবায়নে ইমাম আব্দুল্লাহ আযযামের বয়ানগুলো মৌলিক উপাদান হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

_শেষ দিকের বক্তব্যগুলোতে ইমাম আজম শক্তভাবে ঘোষণা করেছেন, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র মুসলিম বিশ্ব আজ আগ্রাসন কবলিত। তাই ইসলামী ভূমি থেকে আগ্রাসী শত্রুকে উৎখাত করার লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর উপর বৈশ্বিক জিহাদের পতাকা উত্তোলন করা ফরজে আইন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"পৃথিবীতে আর যত মুসলমান রয়েছে, সকলেই ততক্ষণ পর্যন্ত গুনাহগার, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের অধীনে এমন কোন ভূখণ্ড থাকে ইতিহাসের কোনো না কোনো এক সময়ে যা মুসলমানদের অধীনে ছিল। প্রতিটি মুসলমান আন্দালুসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি মুসলমান আফগানিস্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি মুসলমান ফিলিস্তিনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রত্যেকেই ফিলিপাইনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। অধিকৃত এই ভূমিগুলোর ব্যাপারে সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে।"

তিনি আরো বলেন-

"পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে এমন প্রত্যেকেই ফাসেক ও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হবে যদি সে আজ জিহাদ না করে, যদিও সে মসজিদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হয়; যদিও সে দুনিয়া বিমুখ ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি হয়।"

তিনি আরো বলেন-

"এই জিহাদ চালিয়ে নেয়া আমাদের জন্য অনিবার্য। আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে, ফিলিপাইনে এবং যুগের নিপীড়ক কিসরা কায়সারদের আগ্রাসন কবলিত প্রতিটি ভূখণ্ডে জিহাদ পরিচালনা করা যুগের প্রধান ফরজ। কেউ বলতে পারে, আপনি আজ যদি জিহাদের ঘোষণা করেন, এ সত্য আজ যদি আপনি উচ্চারণ করেন, তাহলে গোটা কুফুরি বিশ্ব একযোগে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, প্রতিটি স্থান থেকে তারা আপনাকে টার্গেট করবে; তার জবাবে আমরা বলবো: আজ বুঝি আমরা খুবই ভাল অবস্থায় রয়েছি? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বব্যাপী জায়নবাদী গোষ্ঠী ও মার্কিনিরা আর তাদের সেবাদাস অন্যান্য তাগুত গোষ্ঠী সারা বিশ্বের দিকে দিকে আমাদের মুসলমানদের সঙ্গে তেমনই শত্রুতা ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করছে। প্রতিনিয়ত আমরা তাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছি। তারা সর্বত্রই আমাদেরকে চাপের মুখে ফেলে রেখেছে। আমরা জিহাদের ভূমিতে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছিনা। এমনকি পাকিস্তানের ভূমিতে পর্যন্ত প্রবেশের জন্য আমাদেরকে কত রকম প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হচ্ছে।"

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শেষ দিকের বক্তব্যগুলোতে জোর দিয়ে বলেছেন, জায়নবাদী ও ক্রুসেডার যৌথবাহিনী আজ যেভাবে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো অধিকার করে রেখেছে, তা মোকাবেলার মহোত্তম ও কার্যকরী একমাত্র পন্থা হলো: ইনসাফপূর্ণ সন্ত্রাস পরিচালনার ফরজ দায়িত্ব চর্চা করা। তারা যেভাবে সহিংসতার মাধ্যমে আমাদের ভূমি দখল করেছে, প্রতিরোধের জন্য তেমনই বরাবর সহিংসতার পথ অবলম্বন করা।

এটাই হবে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান। এ প্রসঙ্গেই শাইখ আব্দুল্লাহ তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি প্রদান করেন এবং সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই স্লোগান তোলেন- "আমরা সন্ত্রাসী! বিশ্ববাসী জেনে রাখুক, এই সন্ত্রাস আমাদের ধর্মে ফরজ।" কারণ রক্ত ছাড়া রক্ত হেফাজত হবে না।

আগ্রাসী জায়নবাদী ও ক্রুসেডার যৌথ শত্রু গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ ধর্মচর্চা হল, আমেরিকার দেখানো সেই দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করা, যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ এবং বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সপ্ত আকাশ হতে মনোনীত ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এ প্রসঙ্গেই শায়খ আব্দুল্লাহ (আল্লাহ তাআলা তাঁকে কবুল করুন) বলেন-

"আল্লাহর শত্রুরা ভালোভাবেই জানে, কারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছেন আর কারা পারেনি? যারা সঠিকভাবে এই কালিমার মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছেন, শত্রুদের ভাষায় তারা সাম্প্রদায়িক। আর যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্মকথা উপলব্ধি করতে পারেনি, শত্রুদের ভাষায় তারা মধ্যমপন্থী। শত্রুরা তো খোলাখুলিভাবেই ঘোষণা করে দিয়েছে, আমরা কট্টরপন্থার ইসলাম মেনে নেব না। আমরা তো ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামের পক্ষপাতী। আমরা সনাতন মৌলবাদী ইসলাম সমর্থন করি না। কিন্তু নমনীয় ইসলামের ব্যাপারে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা তো আমেরিকার দেখানো নিষ্কণ্টক ইসলাম চাই। কমিউনিস্টরা কিন্তু সেই ইসলামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু আমেরিকাকে দেখুন, তাদের ব্যাপারে কত সুন্দর বর্ণিত হচ্ছে—

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰ

অর্থঃ "আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে"। (সূরা আল মায়েদা: ৮২)"

_শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শেষ দিকের বক্তব্যগুলোতে খুব জোর দিয়ে বলেন: এই যে আজ মুসলিম ভূখণ্ডগুলো জায়নবাদী ও ক্রুসেডার যৌথবাহিনী দখল করে রেখেছে, এমতাবস্থায় কেউ যদি এই শত্রুপক্ষকে সমর্থন ও সাহায্য প্রদান করে, তবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও সে প্রকাশ্যে ইসলামপন্থী হয় এবং তার বেশভূষা আচরণ-উচ্চারণ সবই মুসলমানদের মতো হয়। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান এই জাতীয় বিপর্যয় ও সংকটের বাস্তব প্রকৃতি যথার্থরূপে অনুধাবনের দাবী হল, বিশুদ্ধ রাজনৈতিক সমান্তরাল অবস্থান ও সমতা নিশ্চিত করার চেতনা ছড়িয়ে দেয়া। আর তখনই আমরা দেখতে পাব, আঞ্চলিক তাগুত গোষ্ঠীর জুলুম, অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জিহাদের ইচ্ছা করা হলেই অনিবার্যভাবে তা বৈশ্বিক কুফুরি শক্তির প্রধান আমেরিকার মোকাবেলায় আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তাইতো শাইখ আব্দুল্লাহ (তাকাব্বালাহুল্লাহু) বলেন-

"আমাদের জন্য এই হুকুম জেনে রাখা ওয়াজিব ও জরুরি, যে ব্যক্তি আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সে কাফের; যে ব্যক্তি ইহুদিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে ইহুদি; যে ব্যক্তি খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে খ্রিস্টান।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

অর্থঃ "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না"। (সুরা আল মায়িদা: ৫১)"

_ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম তাঁর শেষ দিকের বক্তব্যগুলোতে জোর দিয়ে বলেছেন, ইসলামী ভূমিতে আগ্রাসন পরিচালনাকারী বৃহৎ আন্তর্জাতিক সামরিক যে জোট রয়েছে তাদেরকে পরাজিত করা, প্রতিরোধ করা এবং তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো, যেই চোরাবালিতে তারা পা ফেলেছে সেখানেই দীর্ঘ সময়ে তাদেরকে আটকে রাখা, অর্থ ও প্রাণের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য করার মাধ্যমে প্রথমে তাদের অর্থনৈতিক এরপর সামরিক ভিত ধ্বংস করে দেয়া এবং এভাবেই সাম্রাজ্যবাদের এই বধ্যভূমিতে তাদেরকে দীর্ঘ সময় আটকে রেখে দীর্ঘমেয়াদী এক

যুদ্ধ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া। এই ব্যাপারেই শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“যদি আমরা রাশিয়াকে ক্রমে ক্রমে ৫ লক্ষ্য সৈন্য নিযুক্ত করাতে বাধ্য করতে পারি, [ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকা ঠিক এই সংখ্যায় সৈন্য নিয়োজিত করেছিল] তার অর্থ হলো আফগানিস্তানে রাশিয়ার দৈনিক ব্যয় ২৫০ মিলিয়ন ডলার। এ থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি, আফগানিস্তানে রাশিয়াকে তাদের এশিয়ার জন্য নিযুক্ত এলিট ফোর্সের ব্যয় বহন করতে হয়। অথচ বিরাট এ ব্যয় বহনের সক্ষমতা সোভিয়েত ইউনিয়নের নেই। রাশিয়া এ ভুলে পা দেবে, সেটারও সম্ভাবনা আমরা দেখছি না। কিন্তু আবশ্যকীয়ভাবে আমরা একটি কাজ করতে পারি আর তা হল, আমরা তাদের জন্য ভয়াবহ এমন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করব, যা রাশিয়াকে আরো অধিক সৈন্য নিযুক্তি এবং আরো বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য করবে। এভাবেই যুদ্ধের জন্য তাদেরকে আমাদের উস্কে দিতে হবে যাতে করে রাশিয়ার দুর্বলতাকে পুঁজি করে বুখারা ও তাশখন্দে ইসলামী রাজ্যগুলো স্বাধীন হতে পারে”।

_শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শেষ দিকের বক্তব্যগুলোতে জোর দিয়ে আরও বলেন যে, সমকালীন এই জিহাদের প্রতি মুসলিম উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শরীয়তসম্মত সকল পথ ও পন্থা আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে। তাই আমাদেরকে দাওয়াত প্রচার করতে হবে, উম্মাহকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে, অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং একরকম জোরজবরদস্তি করে তাদেরকে এ পথে নিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারটাকে একবার তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন, ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মাহকে সামরিক প্রশিক্ষণ দান’। ঘটনা হলো একবার একলোক আফগানিস্তান থেকে নিজ দেশে ফিরে যাবার জন্য শায়খের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। যাবার কারণ হল, সে ব্যক্তি সামরিক প্রশিক্ষণের ওপর সরকারি সার্টিফিকেট নেবে। তখন তিনি সে ব্যক্তিকে বলেছিলেনঃ “তুমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ সমাপ্তির সার্টিফিকেট লাভের সুযোগ ছেড়ে সেই কোন সরকারি সার্টিফিকেটের পেছনে ছুটছো? এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে?” তাইতো আমরা ইমামকে শুনেছি ওলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের প্রতি এ বিষয়ে জোরদার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেনঃ

“সর্ব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ! ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই পরিত্যাগকারী আর সালাত সিয়াম ও যাকাত পরিত্যাগকারীর মাঝে কোন পার্থক্য দেখি না। নিশ্চয়ই আমি মনে করি, পৃথিবীবাসীর সকলের ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়ে আছে। প্রথমত লোকেরা আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসের কাছে। নিশ্চয়ই আমি মনে করি, এই জিহাদ পরিত্যাগের দরুন দায়িত্বে অবহেলার পক্ষে কোন ওযর আর্জি কাজে আসবে না, চাই তা দাওয়াত হোক, লেখালিখি হোক, আত্মশুদ্ধি হোক অথবা অন্য যে কোন মহৎ কাজ হোক না কেন। নিশ্চয়ই আমি মনে করি, পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী প্রতিটি মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করার অপরাধে অভিযুক্ত। প্রতিটি মুসলমান বন্দুক ছেড়ে দেয়ার অপরাধ বহন করে আছে। মাজুর ও অপারগ ব্যক্তিরা ছাড়া যারাই এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে যে তাদের হাত বন্দুকশূন্য, প্রত্যেকেই গুনাহগার বলে গণ্য হবে কারণ তারা জিহাদ পরিত্যাগকারী। অপারগ ব্যক্তিরা ছাড়া পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী প্রতিটি মুসলমানের ওপর জিহাদ ফরজে আইন।

আর ফরজ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি গুনাহগার। কারণ হলো, ফরজ বলা হয় এমন বিধানকে, যা পালনকারী ব্যক্তি সওয়াব লাভ করে এবং প্রতিদান প্রাপ্ত হয় অথবা যে বিধান পরিত্যাগকারী ব্যক্তি গুনাহগার হয়। নিশ্চয়ই আমি মনে করি, (আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ) জিহাদ পরিত্যাগ করার কারণে আল্লাহ তায়ালার সামনে যেসব শ্রেণীর লোকেরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে, তারা হল, অন্ধ, খোঁড়া, ব্যাধিগ্রস্ত, এমন দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশু যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথ খুঁজে পায়না, অর্থাৎ জিহাদের ভূমিতে সফর করার সাধ্য যাদের নেই এবং যারা পথ চেনে না। এছাড়া আর সকলেই আজ জিহাদ পরিত্যাগ করার কারণে গুনাহগার, চাইতা ফিলিস্তিনের জিহাদ হোক, আফগানিস্তানের জিহাদ হোক অথবা অথবা এমন যেকোন ভূমির, যা কাফেরদের দ্বারা পদদলিত

এবং তাদের অপবিত্রতায় কলুষিত। নিশ্চয়ই আমি মনে করি, আজ আল্লাহর রাস্তায় লড়াইয়ে বের হবার জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই; পুত্রের জন্য পিতার অনুমতির প্রয়োজন নেই, স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ঋণদাতা ব্যক্তির অনুমতির প্রয়োজন নেই, ছাত্রদের জন্য ওস্তাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই এবং অধীন ব্যক্তিদের জন্য অধিনায়ক ও আমিরের অনুমতির প্রয়োজন নেই। সর্বকালে উম্মাহর ওলামায়ে কেরামের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, এমন পরিস্থিতিতে পুত্র তার পিতার অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে যাবে। এ বিষয়ে যদি কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায় তবে সে জুলুমকারী ও সীমালংঘনকারী। এমন ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়েত ও ঐশী নির্দেশনার বাইরে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণকারী। এটি এমনি সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন এক বিষয়, যেখানে কোন প্রকার ধোঁয়াশা সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব ব্যাপারটাকে গুলিয়ে ফেলার কোন সুযোগ নেই। অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এবং বিভিন্ন ঘুরপথে গিয়ে এ বিষয়ে বিকৃতি সাধনের কোনো অপচেষ্টা সফল হবার নয়।

তিন অবস্থায় জিহাদের জন্য আমিরুল মুমিনিনের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে হয় না-

১) যখন আমিরুল মুমিনিন জিহাদ বন্ধ করে দেন।

২) শরীয়তে যেভাবে অনুমতি প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে সেভাবে অনুমতি প্রার্থনার সুযোগ যখন চলে যায়।

৩) আগে থেকেই যখন জানা যায় আমিরুল মুমিনিন জিহাদ করতে বারণ করেছেন।

নিশ্চয়ই আমি তো মনে করি, আফগানিস্তানের যতজন মা-বোনের সম্ভ্রম হরণ হচ্ছে, সেখানে আজ যতজনের রক্ত ঝরছে, সবকিছুর জন্যই মুসলমানরা জিজ্ঞাসিত হবে। নিশ্চয়ই মুসলমানরা —আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন— এই রক্ত ঝরানোর অপরাধে একভাবে শরিক। কারণ তারা নিজেদের দায়িত্বে অবহেলা করছে। তাদের তো সক্ষমতা রয়েছে, আত্মরক্ষার জন্য আমাদের ভাইদের কাছে অস্ত্র প্রেরণ করবে, চিকিৎসার জন্য ভাইদের কাছে চিকিৎসক প্রেরণ করবে, খাদ্য ক্রয়ের জন্য ভাইদের কাছে অর্থ প্রেরণ করবে, গুহা খননের জন্য ভাইদের কাছে সরঞ্জামাদি প্রেরণ করবে।....”তিনি আরো বলেন-

“ইবনে রুশদ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“ইমামের আনুগত্য ওয়াজিব যদিও সে ন্যায় বিচারক না হয় এবং যদিও সে ফাসিক হয়; কিন্তু এমন অবস্থায় ওয়াজীব নয় যখন সে কোন গুনাহের আদেশ দেয়। আর ফরজে আইন জিহাদে বারণ করা অবশ্যই গুনাহ’র আদেশের অন্তর্ভুক্ত”।

অর্থাৎ ইবনে রুশদ কুরতুবী মালিকি বলতে চাচ্ছেন: যে বিধান ফরজে আইন হয়ে গিয়েছে তার পরিত্যাগের পক্ষে কারো আনুগত্য বৈধ নয়। আনুগত্য হবে তো কেবল ভালো বিষয় পালনের ক্ষেত্রে। ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“শত্রু যখন আক্রমণ করে বসে, তখন করণীয় নিরূপণে মতভেদের কোন কিছুই বাকি থাকেনা। কারণ আল্লাহর দ্বীন, নিজেদের প্রাণ ও সম্মান রক্ষা করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। তাই এমতাবস্থায় আমিরুল মুমিনীনের অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই”।

ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ’র কথা শেষ হয়েছে। অর্থাৎ যদিও আমিরুল মুমিনিন সশরীরে উপস্থিত ও বিদ্যমান থাকেন, তবুও অনুমতির প্রয়োজন নেই।”। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের সংকলিত এতসব বক্তব্য, বয়ান ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিধায় আমরা বলতে পারি যে, তাঁরই শিষ্য ইমাম উসামা বিন লাদেনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পূর্ণরূপ সাধন, তার চিন্তার পরিচিতি বিস্তার ও বাস্তবায়নের স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্র রচনায় শাইখ আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ’র এই বয়ানগুলো প্রধান ভূমিকা রেখেছে এবং এগুলোর মাধ্যমেই ইমাম আব্দুল্লাহ’র অন্যান্য শিষ্যবৃন্দ উসামা বিন লাদেনের সঙ্গ গ্রহণ করে মুসলিম উম্মাহর চলমান রাজনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় ইবনে লাদেনের ট্যাকটিক্যাল ও স্ট্র্যাটেজিক প্রেসক্রিপশন মেনে নিয়ে ময়দানে শ্রম ও প্রাণ বিসর্জন দিতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ইতিহাস সৃষ্টিকারী এমনই এক মহানায়কের নাম আবু মুসআব সূরী। জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় আল্লাহ তার উপর রহম করুন! তিনি তাঁর একক মুক্তোতুল্য

যুগসেরা গ্রন্থ 'দাওয়াতুল মুক্বাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল আলামিয়্যাহ'-য় বলেন-

"মহান শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম আবু মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ'র কিতাবাদি, বিভিন্ন খুতবা, মেহনতের ফসল ও অডিও-ভিডিও লেকচারের ফাইলগুলো যদি কেউ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তবে তার সামনে শাইখের মেহনত ও সাফল্যের এক বিরাট দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে উঠবে। সে দেখতে পাবে, অনুসারী, ভক্তবৃন্দ ও ছাত্রদের মনে তিনি কিভাবে আমেরিকা, মুরতাদ গোষ্ঠী এবং তাদের সর্বশ্রেণীর সেবাদাস ও দোসরদের ব্যাপারে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও আক্রোশের বীজ বপন করেছেন। আর কেনই বা তিনি করবেন না? অথচ প্রথমে ফিলিস্তিনে তারপর জর্দানে তিনি এই শয়তানদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন।

আর শেষবার পাকিস্তানে; এই দফায় বেনজির ভুট্টো এবং পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবরের সময়ে আমেরিকার নির্দেশনা ও ইশারায় শয়তানরা তাকে হত্যা করে ফেলে। তাই এই প্রজন্মের মুজাহিদদের কাঁধে ঘাতক শয়তানদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার আমানত ঝুলে আছে। এদিকে শাইখ উসামা আফগানিস্তান ও তার বাইরে জিহাদী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আল-কায়েদা গঠন করেন। আফগানিস্তানের বাইরে এর শাখা গঠনের উদ্দেশ্য থাকে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জিহাদি শক্তিকে একটি সুশৃংখল সাংগঠনিক-বলয়ের মাঝে আনার মধ্য দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ করার মাধ্যমে এগুলোর শক্তি বৃদ্ধি করা। এমনিতে আগে থেকে দক্ষিণ ইয়ামেনে সাবেক কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে তার বিশেষ জিহাদী প্রকল্প ও কর্মসূচি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন তার আশানুরূপ হয়নি। প্রকল্পটি শুধুই ইয়েমেনের পরিসরে আটকা পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ অঞ্চল ভিত্তিক অপরাপর জিহাদী সংগঠনের মতই তাদের অবস্থা হয়েছিল।

এ থেকেই তিনি আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উপাদানগুলি সন্নিবেশিত করা এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি ময়দান তৈরি করেন। অন্যান্য আরব আফগান প্রশিক্ষণ শিবিরের মতই তা রূপরেখা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর আফগানিস্তানে একটি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সাধারণ লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি ছাড়াও আরো অনেকে তখন একই কাজ করেছিলেন। ১৯৮৮—১৯৯১ সালের অন্তর্বর্তী সময়টাতে আল-কায়েদার বিভিন্ন শিবিরে সামরিক প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে খণ্ডিত আকারে আমিও কিছু কাজ করেছিলাম। একইভাবে আল-কায়দাসহ অন্যান্য সংগঠনের শিবিরগুলোতে আমি মানহাজ পর্যালোচনা, শরিয়া রাজনীতি, বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার লড়াই বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে ক্লাস নেয়া ও লেকচার প্রদানের কাজ করেছি। সে সময় আমি আরব আফগান যৌথ জিহাদে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সংগঠনের প্রধানদের সঙ্গে এবং নিযুক্ত কর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। সময়টা এখন কেমন ছিল যখন আফগানিস্তানের বাইরে অন্য কোন ময়দানে আল-কায়েদার কোন সক্রিয় কার্যক্রম ছিল না। আর ইয়েমেন ছাড়া অন্য কোথাও শাইখ উসামার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অন্য কোন প্রকল্প ছিল না।

তবে বিভিন্ন স্থানে জিহাদি বিভিন্ন সংস্থা ও কার্যক্রমকে আর্থিক ও বৈষয়িক পৃষ্ঠপোষকতা দানের কথা ভিন্ন। আমি আসলে যতোটুকু জানি সেখান থেকে এই কথাগুলো বললাম। আমি মনে করি এবং বিশ্বাস করি, সে সময় শাইখের নিকটে থাকার কারণে আমার উপরোক্ত ধারণা প্রকৃত বাস্তবতার সবচেয়ে কাছাকাছি। আসলে সে সময় শাইখের আশেপাশে যারা ছিলেন আমি ছিলাম তাদের প্রথম সারির অন্যতম সদস্য। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে আমি আফগানিস্তান ত্যাগ করি।

স্পেনে আমার আবাসস্থলে আমি ফিরে আসি। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তালেবানের আমন্ত্রণে আমাদের পুনঃ সাক্ষাৎ ঘটবার আগ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আমার কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। এদিকে শাইখ উসামা তাঁর বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলকে নিয়ে সুদানে সফর করে চলে যান। তখনো কার্যত অন্য কোন দিকে তাদের কোন প্রকার সক্রিয়তা প্রকাশ পায়নি।"

উভয় ইমামের সংগ্রামী জীবনের এই ঐতিহাসিক প্রত্যয়নপত্র থেকে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সামনে লেখক মহোদয়ের এমন দাবির অসারতা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, শায়খ উসামা বিন লাদেনের সংগ্রাম ও সাধনার গতিমুখ এবং তার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি শরীয়তের আন্দোলন ও রাজনীতি বিষয়ক সেসব মূলনীতির তোয়াক্কা করেনি, যেগুলোর ওপর পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মহান ইমাম শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম। লেখক মহোদয় এই ভুল ধারণা প্রচার করেছেন যে, 'অপরাপর মুসলিম ভূখণ্ডের বিভিন্ন ইসলামী প্রতিরোধ সংগ্রামের নানা উদ্যোগে পৃষ্ঠপোষকতা দান এবং শক্তি সরবরাহের প্রতি ইবনে লাদেন একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করেননি, আফগান জিহাদের জন্য জনসমর্থন, তথ্যপ্রযুক্তি ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেননি, মুজাহিদদের মাঝে একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল না এবং মুজাহিদদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ লড়াইগুলোতে অংশগ্রহণে তিনি বারণ করতে পারেননি'।

ইতিহাস ও বাস্তবতার বিকৃতি তো বটেই, নিজ রচনার মাধ্যমে লেখক মহোদয় পাঠক মনে বিভিন্ন অসত্য, ভ্রান্ত ও অমূলক ধারণা ও বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সহায়তা করেছেন।

—চলবে...